প্রকাশক :—
এন্, এম্, রায়চৌধুরী এণ্ড কোং
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী, বি, এ,
১১ নং কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা

দেড় টাকা

শ্রীঅদ্বৈত প্রেস
১০ নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
শ্রীগোপালচন্দ্র নন্দী দ্বারা মুদ্রিত।

প্রবাসী

সে একদিন ছুপুরবেলা ধরণীর তপ্তবুকে বিরহী আকাশের নীল নয়ন থেকে কয়েক ফোঁটা অশ্রুজল ঝর্-ঝর্ কোরে ঝরে পড়্ল্। ক'দিন থেকে অসহ্য গ্রীষ্মের তাপে ঘরের মধ্যে বসে থাকা অথবা ঘর থেকে বের হওয়া দুই অসম্ভব হোয়ে উঠেছিল। ছুপুর বেলা এই এক পস্লা বৃষ্টি হোয়ে যাওয়ায় শহরটা যেন একটু ঠাণ্ডা হোলো। ঠিক এই সময়ে কলকাতার উপকণ্ঠ বালীগঞ্জের একটা চওড়া রাস্তা দিয়ে একটি বাঙালী যুবক মন্থরগতিতে এগিয়ে চলেছিল। রাস্তায় লোক-জন, গাড়ী-ঘোড়া কিছু নেই, নির্জ্জন পল্লী।

যুবকের দেহ বলিষ্ঠ। গায়ের রং এক সময় গৌর ছিল কিন্তু দেখলেই বুঝতে পারা যায় যে, রং চটে গিয়েছে। মাথার চুল ছোট-ছোট কদম-ছাঁটে ছাঁটা। তার পরনে একখানা মোটা ধুতি, হাঁটু ছাড়িয়ে বেশী দূর নামে নি। গায়ে একটা মোটা কাপড়ের পিরাণ, পায়ে এক জোড়া রাওলপিণ্ডির নাগ্রা আর হাতে একটি ছোট্ট পুঁট্লী।

যুবক ক্লান্ত শরীর নিয়ে মন্থরগতিতে চল্‌ছিল। কিছুদূর অগ্রসর হোয়ে একখানা বাগান-ঘেরা ছোট্ট বাড়ীর সাম্‌নে দাঁড়িয়ে কি ভেবে আবার সে এগিয়ে চল্‌ল। এবারে সে একটা বড় বাড়ীর সাম্‌নে এসে দাঁড়াল। এ বাড়ীখানার চতুর্দ্দিকে বড় বাগান। বাড়ীর সাম্‌নে ফোয়ারা, বাগানের মাঝে-মাঝে ছোট বড় পাথরের মূর্ত্তি।

যুবক কিছুক্ষণ রাস্তায় দাঁড়িয়ে আস্তে-আস্তে অগ্রসর হোয়ে ফটক পেরিয়ে বাড়ীর বাগানে এসে পড়্‌ল। বাগানের মধ্যে লাল কাঁকর-ফেলা রাস্তা একেবারে গাড়ী-বারান্দা পর্য্যন্ত গিয়েছে। রাস্তার দু-দিকে ঘাস-জমি। যুবক বাগান পেরিয়ে গাড়ী বারান্দার তলায় এসে দাঁড়াল। এখান থেকে চওড়া সিঁড়ি একেবারে দোতলার ড্রইং-রুমের দরজা পর্য্যন্ত পৌঁচেছে। ড্রইং-রুম থেকে পিয়ানোর আওয়াজের সঙ্গে অতি মৃদু নারী কণ্ঠের সঙ্গীত ভেসে আস্‌ছিল। যুবক নিঃশব্দপদসঞ্চারে সিঁড়ি দিয়ে উঠে সেই ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুক্‌ল।

ঘরটি সুসজ্জিত। একদিকে একটা বড় সোফার ওপরে বিজলী পাখা ঘুরছে। সোফার ওপরেই একখানা খোলা ইংরেজী উপন্যাস পড়ে রয়েছে। বেশ বুঝতে পারা যায় যে, সেখানে কেউ বসেছিল, এখুনি ফিরে আস্‌বে বলে পাখা বন্ধ করে-নি। ঘরের এক কোনে দেওয়ালের দিকে মুখ কোরে একটি যুবতী পিয়ানো বাজিয়ে গান গাইছিল—দারুণ অগ্নিবাণে, রে— তৃষায় হাণে রে—

দ্রুত।

যুবতী বাজনার সঙ্গে এমন তন্ময় হোয়ে গান গাইছিল যে যুবকের আগমন সে টেরই পেলে না। যুবক ধীরে-ধীরে সেই চল্‌তি পাখাখানার নীচে সোফায় গিয়ে বস্‌ল। তারপরে পুঁটলীটা মাথায় দিয়ে সেইখানেই সটান শুয়ে পড়্‌ল। যুবক ক্লান্ত হয়েছিল, কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই সে ঘুমিয়ে পড়্‌ল।

গান কিন্তু বেশীক্ষণ চল্‌ল না। পাশের একটা ঘর থেকে আহ্বান এল—অনু—

যুবতী তৎক্ষণাৎ পিয়ানো থামিয়ে মোটা পরদা ঠেসে সেই ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। কিছুদূরে সোফায় যে কে শুয়ে রয়েছে তা সে দেখতেও পেলে না।

যুবক নিদ্রায় বিভোর হয়েছিল। কিন্তু সে সৌভাগ্য তাকে বেশীক্ষণ ভোগ কর্‌তে হোলো না। একটু পরেই একদল মেয়ে কলরব করতে-করতে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল। হঠাৎ অতগুলি নারী-কণ্ঠের শব্দ কানে যেতেই তার ঘুম ভেঙে গেল। মেয়েগুলি ঘরের মধ্যে ঢুকেই তাকে দেখে একটু অপ্রস্তত হোয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে পর্দ্দা ঠেলে পাশের ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়্‌ল।

যুবক এবার একটু হেসে উঠে বস্‌ল, কিন্তু বেশীক্ষণ তাকে একলা বসে থাকতে হোলো না। মিনিট দুই-তিন পরে নবাগতা মেয়েরা অনুকে নিয়ে ড্রইং-রুমে ফিরে এল। অনু দূর থেকে যুবককে বল্লে—কে আপনি! কাকে চান?

যুবক ভারি গলায় উত্তর দিলে—আমাকে চিনতে পারলেন না। আমি আপনার মার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

যুবকের কথা শুনে অনু তার সঙ্গিনীদের ছেড়ে কয়েক পা এগিয়ে এসে তাকে ভাল কোরে দেখতে লাগল। তারপরে হঠাৎ বিস্ময়-উল্লাসে চাপা-গলায় বলে উঠ্‌ল—কে! দাদা?

যুবকের মুখ থেকে এ প্রশ্নের কোনো উত্তর বেরুবার আগেই অনু চীৎকার কোরে উঠ্‌ল—বৌদি, মা শীগ্‌গীর এস—দাদা এসেছে।

অনুর চীৎকার শুনে ড্রইং-রুমের দুই কোনের দুই ঘর থেকে দুটি নারী বেরিয়ে এল। এঁদের মধ্যে একজন প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমায় পৌঁচেছেন, আর একজন যুবতী। প্রৌঢ়া দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্যা হোয়ে ছুটে এসে যুবককে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে-কাঁদতে বল্লেন—এমনি কোরেই কি মাকে ভুলে থাকতে হয় বাবা?

যুবকের চক্ষুও অশ্রু-ভারাক্রান্ত হোয়ে উঠেছিল কিন্তু সে কোনো রকমে অশ্রু চেপে চুপ কোরে দাঁড়িয়ে রইল। এই নিস্তব্ধতা ভেঙে অনু চীৎকার কোরে বল্লে—দাদা, বৌদিকে চিনতে পারছ?

যুবক তার পাশে দণ্ডায়মানা নারীর দিকে চেয়ে বল্লে—বৌদি ভাল আছ?

—ভাল আছি—বলে সে কয়েক পা এগিয়ে এসে যুবকের পিঠে সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিতে লাগ্‌ল।

অনু তার সঙ্গিনীদের মধ্যে একজনকে ডেকে বল্লে—মণি দাদাকে চিন্‌তে পারছিস্ না ?

মণি বল্লে—প্রথমে দেখেই আমার খট্‌কা লেগেছিল কিন্তু ঠিক ধরতে পারি-নি। এতদিন পরে দেখলুম তার ঠিকানা নেই।

অনু বল্লে—ঠিক এগারো বছর। দাদা যখন নিরুদ্দেশ হোয়ে গেল তখন আমার এগারো বছর বয়স। জানো দাদা, আজ আমার জন্মদিন। আজকে আমি বাইশ বছরে পড়লুম।

যুবক বল্লে—আজকে তোর জন্মদিন জান্‌লে যে আসবার সময় চকোলেট কিনে আন্‌তুম। তুই চকোলেট খেতে এখনো সেই রকম ভালবাসিস্ ?

অনু বল্লে—না দাদা আমি আর চকোলেট খাইনে। তোমায় দেখে আজকে আমার যে কি আহ্লাদ হচ্ছে তা কি বল্‌ব দাদা।

আনন্দের আতিশয্যে অনু এগিয়ে এসে তার দাদার একখানা হাত ধর্‌লে। যুবক অপরাধীর মত তার মার মুখের দিকে চাইতে লাগ্‌ল। কিন্তু সে কিছু বলবার আগেই মণি বলে উঠ্‌ল—দীপ-দা, আমি কিন্তু চকোলেট খেতে এখনো সেই রকম ভালবাসি।

দীপক বল্লে—বেশ, তা হোলে আজকে চল্—সন্ধ্যেবেলা সদলবলে মার্কেটে যাওয়া যাক্।

অন্থু বল্লে—বারে, আজকে কি কোরে হবে? আজ আমার জন্মদিনে বন্ধুদের নেমতন্ন করেছি যে!

[illegible] বল্লে—যাক্ তা হোলে কাল হবে। এখন স্নান করিগে।

সে মার দিকে ফিরে বল্লে—মা আজ তোমার হাতের রান্না খাব।

অনাদিচরণ বসু ছিলেন প্রথম যুগের ব্রাহ্ম। যৌবনে তাঁরা যখন ব্রাহ্ম হয়েছিলেন তখন বাঙালীর সমাজের অবস্থা নাকি খুব খারাপ ছিল। তাঁরা শুধু যে সমাজের কুসংস্কারগুলির প্রতি সচেতন হোয়ে উঠলেন তা নয়, দিনে-দিনে তাদের প্রতি একটা বিজাতীয় বিতৃষ্ণা ও ঘৃণা তাঁদের মনে সঞ্চিত হোয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। অনাদিচরণের স্ত্রী ছিলেন হিন্দু-সমাজের মেয়ে। তাঁর স্বামী যখন ব্রাহ্মসমাজে ডবল-প্রোমোশন পেয়ে এগিয়ে যেতে লাগ্‌লেন তিনি তখন তাঁর অনেক পেছনে খুঁড়িয়ে অগ্রসর হোতে লাগ্‌লেন।

তারপর অনেকদিন হোয়ে গেল। অনাদিচরণের এক মেয়ে ছাড়া আর সন্তানাদি হোলো না। মেয়ে বড় হোলো, মেয়ের বিয়ের সময় হোলো। অনাদিচরণ পাত্রের অনুসন্ধান করতে আরম্ভ করলেন। পাত্রও জোগাড় হোলো, বেশ সুপাত্র, বিলেত থেকে পাশ কোরে এসেছে। কিন্তু অনাদিচরণের স্ত্রী

২ এই বিয়েতে আপত্তি তুল্লেন। আপত্তির প্রধান কারণ হচ্ছে,

পাত্র দেখতে খারাপ আর বিলেত থেকে পাশ কোরে এসে কি হবে—সে জাতিতে ছিল কৈবর্ত্ত—বর্ত্তমানে ব্রাহ্ম।

ব্রাহ্ম সমাজে অনেক পরিবার আছেন যাঁরা তর্কের স্থলে জাতি বিচারকে দেশোন্নতির পরিপন্থী বলে উড়িয়ে দিলেও নিজেদের পারিবারিক অনুষ্ঠানের মধ্যে খুব সূক্ষ্মভাবে জাতি বিচার মেনে চলেন। অর্থাৎ যাঁরা ব্রাহ্মণ তাঁরা প্রথমত ব্রাহ্মণ-পরিবারের সঙ্গে অথবা বড় জোর কায়স্থ পরিবারের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হোতে পারেন, এর নীচে নয়। অনাদিচরণের স্ত্রী এই বিবাহে আপত্তি তোলবার পর দু-চার জন এই শ্রেণীর ধর্ম্মবন্ধুও তাঁর কথায় সায় দিলেন। অনাদিচরণ তখন বৃদ্ধ। জীবনের দীপ্ত দ্বিপ্রহরে যে সামাজিক সংস্কারগুলির খারাপ দিকগুলি চোখের সামনে জল্‌জল্ করতে থাক্‌ত, বেলা শেষে দৃষ্টির প্রখরতা কমে যাওয়ায় সেগুলিকে তাঁর আর তেমন খারাপ বলে মনে তো হোতোই না বরং সেকালে যে-সব পণ্ডিতরা এই সব বিধান করেছিলেন তাঁদের চাইতে তিনি বেশী সমাজহিতৈষী কি না এই রকম একটা সন্দেহ প্রায়ই তাঁর মনের মধ্যে জাগতে থাক্‌ত।

এই সমস্ত সমস্যায় পড়ে অনাদিচরণ অত্যন্ত অশান্তিতে কাটাচ্ছিলেন এমন সময় তাঁদের কন্যা সুমনা সমস্ত সমস্যাটার একটা সরল সমাধান কোরে দিলে।

বিশ্বমোহন মিত্র নামে একটি যুবক তখন ব্রাহ্ম সমাজে খুব যাতায়াত করত। বিশ্বমোহন নিজে ব্রাহ্ম না

হোলেও ছাত্র-সমাজ, যুবক-সমিতি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের একজন উৎসাহী সভ্য ছিল। বিশ্বমোহন ব্রাহ্ম সমাজের অনেকের বাড়ীতেই যাতায়াত কর্‌ত এবং অনেকেই তাকে ভালবাসতেন। বৃদ্ধরা মনে করতেন যে, স্বাবলম্বী হোতে পারলেই সে ব্রাহ্ম সমাজের সভ্য হোয়ে পড়্‌বে।

অনাদিচরণের বাড়ীতেও বিশ্বমোহনের যাতায়াত ছিল। সুমনার বিয়ে নিয়ে সমাজের মধ্যে যখন এই রকম আন্দোলন চলেছে সেই সময় বিশ্বমোহন একদিন অনাদিচরণকে চিঠি লিখে তাঁর কন্যার পাণি প্রার্থনা করলে।

পাত্র হিসাবে বিশ্বমোহন খুব নিরেস ছিল না। সে এম, এ পাশ কোরে আইন পড়ছিল। কিন্তু সে ছিল দরিদ্র। ধনী ভগ্নীপতির সাহায্যে সে কলকাতায় থেকে লেখাপড়া করছিল। অন্য সময়ে হোলে হয়ত বিশ্বমোহনের মতন দরিদ্র অজ্ঞাতকুলশীল পাত্রের হাতে ধনী অনাদিচরণ তাঁর একমাত্র কন্যা সুমনাকে অর্পণ করতে দ্বিধা বোধ করতেন। কিন্তু সেই দারুণ সামাজিক ঘোঁট পাছে নিদারুণ হোয়ে ওঠে এই ভয়ে তিনি বিশ্বমোহনের হাতেই তাঁদের একমাত্র কন্যা সুমনাকে সমর্পণ করলেন।

বিশ্বমোহনকে জামাই কোরে কিন্তু অনাদিচরণ কিংবা তাঁর স্ত্রীকে ভবিষ্যতে একদিনের জন্যও আফ্‌শোষ করতে হয়-নি। সে ছিল ধীর, বুদ্ধিমান ও সংযমী। বিয়ের কিছু পরেই সে এখানে বি এল পাশ কোরে শ্বশুরের অর্থে বিলেত গিয়ে সেখান থেকে ব্যারিষ্টার হোয়ে ফিরে এল।

বিলেত থেকে বিশ্বমোহন একেবারে খাঁটি সাহেব ও পাকা ব্রাহ্ম হোয়ে ফিরে এলেন। তাঁর চলন-ফেরন, বলন-কওন, আহার ইত্যাদি সমস্তই খাঁটি ইংরেজী ধরণের হোয়ে উঠল। সুমনা ব্রাহ্ম সমাজের মেয়ে হোলেও এতখানি সাহেবীয়ানায় কখনো অভ্যস্ত ছিলেন না। স্বামী যখন তাঁর হাত ধরে সাহেবীয়ানার পাকা সড়ক দিয়ে ছুট্‌তে লাগলেন তখন তাঁর অনভ্যস্ত পদ প্রতিপদেই জড়িয়ে যেতে লাগ্‌ল। এজন্য বিশ্বমোহনের মনে ক্ষোভের অন্ত ছিল না।

খাঁটি সাহেব বল্‌লেও সাহেবীয়ানার খারাপ জিনিষগুলিকে বিশ্বমোহন বিষবৎ পরিত্যাগ করতেন। এদিক দিয়ে তিনি ছিলেন আবার উৎকট ব্রাহ্ম। মদ তো দূরের কথা, তিনি তামাক চুরুট পর্য্যন্ত স্পর্শ করতেন না। তাঁর বাড়ীতে এমন কি চাকর বাকরদের কারুকে তামাক খেতে দেখলে তিনি ধম্‌কে দিতেন।

বিলেত থেকে ফিরে এসে কয়েক বছর অক্লান্ত পরিশ্রম কোরে বিশ্বমোহন হাইকোর্টে প্রভূত পশার জমিয়ে ফেল্লেন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি বালীগঞ্জে এক দেউলে নবাবের বাগান ও প্রাসাদ কিনে সেখানে বাস করতে আরম্ভ করলেন।

শ্বশুরবাড়ীর সম্পর্ক ছাড়া বিশ্বমোহনের সংসার-সম্বন্ধে এক বোন ও ভগ্নীপতি ছাড়া আর কেউ ছিল না। তিনি যখন বিলেতে তখন তাঁর ভগ্নীপতির মৃত্যু হয়। নতুন বাড়ীতে এসে কিছুদিন বাস করবার পর তাঁর বিধবা ভগ্নীও মারা গেলেন।

মৃত্যুর সময় তিনি বিশ্বমোহনের হাতে তাঁর স্বামীর বিষয় ও একমাত্র পুত্র অজয়কুমারের ভার দিয়ে গেলেন।

অজয়কুমারের বয়স তখন সবে মাত্র চৌদ্দ হোলেও ইতি-পূর্ব্বেই তার বিয়ে হোয়ে গিয়েছিল। বিশ্বমোহনের ভগ্নীপতি মৃত্যুর পূর্ব্বেই একটি পিতৃমাতৃহীনা শিশু-কন্যার সঙ্গে তাঁর ছেলের বিয়ে দিয়ে ছোট্ট-বৌ ঘরে রাখার সাধ মেটাচ্ছিলেন। কিন্তু এই বিয়ের কিছুকাল পরেই তাঁদের স্বামী স্ত্রীর সব সাধই মিটে গেল।

ভগ্নীর মৃত্যুর পরই বিশ্বমোহন তাঁর ভাগ্নে অজয় ও আট বছরের ভাগ্নে-বৌ শান্তিকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে এসে মানুষ করতে লাগলেন।

বিশ্বমোহনের ইতিমধ্যে একটি মাত্র ছেলে ছাড়া আর সন্তান হয়-নি। তাঁর ছেলে দীপক ও ভাগ্নে-বৌ শান্তি সমবয়সী। তিনি অজয়কে কলকাতায় এনেই স্কুলে ভর্ত্তি করিয়ে দিলেন এবং যে মেম শিক্ষয়িত্রী দীপককে বাড়ীতে পড়াতেন শান্তিকেও তাঁর কাছে দিলেন।

বিশ্বমোহনের মতামত যা ছিল তাঁর নিজের জীবনেও তিনি তা কাজে খাটাতেন। বাল্য-বিবাহকে তিনি অত্যন্ত ঘৃণা করতেন এবং চোখের সামনে তাঁর নিজের বাড়ীতেই বাল্য বিবাহের সেই জীবন্ত নিদর্শন নিয়ত তাঁকে পীড়া দিতে লাগ্‌ল। শেষকালে অনেক চিন্তার পর অজয় ও শান্তিকে আলাদা রাখবার জন্য তিনি সেই বয়সেই অজয়কে পড়াশুনার জন্য

বিলেতে পাঠিয়ে দিলেন। দীপক ও শান্তি এখানে ভাই বোনের মত একত্রে মানুষ হোতে লাগ্‌ল।

নিজের বাড়ীতে বিশ্বমোহন কোনো রকমের ত্রুটি সহ্য করতেন না। তাঁর বাড়ীর প্রত্যেক লোককেই ভোর পাঁচটার মধ্যে উঠ্‌তে হোতো এবং রাত্রি দশটার মধ্যে সমস্ত আলো নিভিয়ে দিতে হোতো। চায়েতে তিনি আধ চাম্‌চের বেশী চিনি খেতেন না, তাই আর কারুর তার চেয়ে বেশী চিনি চা'তে খাবার যো নেই। এই রকমভাবে সামাজিক মতামতগুলো যতই তাঁর উদারতা লাভ করতে লাগ্‌ল ব্যক্তিগত কার্য্য-কলাপগুলো তেমনি কঠিন নিয়মের বাঁধনে বাঁধা পড়্‌তে স্থরু হোলো।

স্থমনা স্বামীর ইচ্ছা, আজ্ঞা ও অনুরোধ অনুরাগের সঙ্গে পালন করতেন। স্ত্রীর জন্য এদিক দিয়ে তাঁকে কোনো অস্থবিধায় কখনো পড়তে হয়-নি। কিন্তু তাঁদের ছেলে দীপক বড় হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে বিশ্বমোহনের ঘরে উৎপাত স্থরু হোলো। দীপক একটা চকোলেট শেষ কোরে তখুনি আর একটা খেতে চায়, কিন্তু বিশ্বমোহনের তাতে আপত্তি। দীপক চীৎকার স্থরু করলে। স্থমনা স্বামীকে বল্লেন—আহা ছেলেমানুষ চাইছে দাও না।

বিশ্বমোহন ছেলেকে ধমক দিয়ে স্ত্রীকে বল্লেন—না না, আস্কারা দিলে বিগ্‌ড়ে যাবে।

পিতা হুকুম দিয়ে কোর্টে চলে গেলেন। আর ছেলে

সমস্তদিন চকোলেট খাবার জন্য মার প্রাণ অস্থির কোরে তুলতে লাগল। স্বামী দিলেন হুকুম কিন্তু শাস্তি ভোগ করতে হোলো স্ত্রীকে।

দীপক আরও একটু বড় হোলো। একদিন বিশ্বমোহন বাড়ী ফিরে দেখলেন যে, তাঁর ছেলে ছাদের ওপরকার একটা উঁচু মিনারের ওপরে বসে রয়েছে। তিনি তৎক্ষণাৎ দীপককে ডেকে এনে ও-রকম উচ্চ স্থানে আরোহণ করা ও তার বিপজ্জনক সম্ভাবনা সম্বন্ধে অনেকক্ষণ বক্তৃতা দিয়ে পুনর্ব্বার এ কাজ করতে বারণ কোরে দিলেন। কিন্তু ছাদের ওপরে সেই অত্যন্ত অনাবশ্যক ও দুর্গম স্থানটীই ছিল দীপকের কল্পরাজ্য। আবার একদিন বিশ্বমোহন দীপককে সেই টংয়ে বসে থাকতে দেখে তাকে ডেকে এনে কিছু দক্ষিণা দিয়ে ছাদের সিঁড়ির দরজায় তালা লাগিয়ে দিলেন।

ছাদের দরজা বন্ধ হোলেও বাড়ীতে উচ্চ, অনাবশ্যক ও দুর্গম স্থানের অভাব ছিল না। দীপক বাগানের আম, জাম বট, পাকুড় ও কৃষ্ণচূড়ার শাখায়-শাখায় ঘুরে বেড়াতে আরম্ভ করলে। বিশ্বমোহন একমাত্র শিশু-পুত্রের এই অবাধ্যতায় ব্যতিব্যস্ত হোয়ে উঠলেন।

বিশ্বমোহন পরিবারের সকলকে নিয়ে প্রত্যহ ব্রহ্মোপাসনা করতেন। সবাই যখন চোখ বুঁজিয়েছে ঠিক সেই সময় হয়ত 'খুঁক' কোরে একটা শব্দ হোলো। সবাই চোখ চেয়ে দেখলে যে, দীপক তার বালক চাকর নেন্‌কুকে মুখ ভ্যাঙচাচ্ছে।

অজয় যখন বিশ্বমোহনের বাড়ীতে এল তখন তার বয়স প্রায় চৌদ্দ। মামার কড়া মেজাজ সে তুদিনেই বুঝে নিলে। যে কাজ করলে মামার চক্ষু রক্তবর্ণ হবার সম্ভাবনা সে কাজ সে মামার চোখের আড়ালেই সারত। শান্তি ছিল শান্ত ও বুদ্ধিমতী। তার ওপরে সেই পিতৃমাতৃহীনা মেয়েটীকে বিশ্বমোহন এত ভালবাসতেন যে তার দোষ ক্রটি তাঁর চোখেই পড়ত না। সংসারে যত উৎপাত ও অশান্তির কেন্দ্র হোয়ে দাঁড়াল দীপক।

এইভাবেই দিন কাটছিল এমন সময় হঠাৎ একটা তুচ্ছ ব্যাপারে বিশ্বমোহনের সংসারে বড় রকমের একটা পরিবর্ত্তন হোয়ে গেল।

অজয়কুমার বিলেত চলে যাবার কিছুদিন পরে একদিন বিকেল বেলা বিশ্বমোহন কাছারী থেকে ফিরে দেখলেন যে, দীপক তাদের একটি চাকরকে খুব মারছে। এই ছেলেটী ছিল দীপকের খাস চাকর। চাকর হোলেও বালকত্ব তখনো তার যায়-নি। প্রায়ই খেলার সময় বালক চাকরের সঙ্গে বালক মনিবের মতান্তর উপস্থিত হোতো। সেদিন খেলতে-খেলতে কি নিয়ে ঝগড়া হওয়ায় দীপক ধাঁ কোরে তার মুখে একটা ঘুসি মেরে দেওয়ায় সে বেচারীর ঠোঁট কেটে রক্ত পড়তে লাগল। ঠিক সেই সময় বিশ্বমোহন কাছারী থেকে বাড়ীতে ফিরেই এই দৃশ্য দেখে দীপককে বাগান থেকে বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে শাসন করতে সুরু করলেন। সুমনা কিছুই জানতেন না। তিনি ছেলের চীৎকার শুনে ছুটে এসে তাকে বিশ্বমোহনের হাত থেকে

উদ্ধার করলেন। বিশ্বমোহনের রাগ তখনো যায়-নি। তিনি স্ত্রীকে বল্লেন—ছেলেকে শাসন করবার সময় তুমি কখনো কাছে এসো না। এই কোরেই তো ছেলেটাকে নষ্ট করলে।

রাগের মুখে সেদিন বিশ্বমোহন স্ত্রীকে আরও এমন অনেক কথা বল্লেন যা সুমনা ইতিপূর্ব্বে স্বামীর কাছে কখনো শোনেন-নি। তিনি কোনো রকমে অশ্রু সম্বরণ কোরে দীপককে সেখান থেকে টেনে নিয়ে চলে গেলেন।

সুমনা দীপককে সেখান থেকে নিয়ে গিয়ে জামা খুলে দেখ-লেন যে, তার সর্ব্বাঙ্গে কালশিরে পড়ে গিয়েছে। পুত্রের কোমল অঙ্গে যে বেত্রাঘাতগুলি তাদের চিহ্ন রেখে গিয়েছে মায়ের হৃদয়ে সেগুলো শতগুণ জোরে ফিরে এসে লাগ্‌তে লাগ্‌ল। সুমনা আর কান্না চেপে রাখতে না পেরে ছেলেকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে আরম্ভ কোরে দিলেন।

ছেলে মার আদরে অঙ্গের ব্যথা প্রায় ভুলে গিয়েছিল কিন্তু মাকে কাঁদতে দেখে সে-ও আবার মার গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে আরম্ভ কোরে দিলে। বিশ্বমোহন পাশের ঘরেই বসেছিলেন, তাঁর রাগ তখনো থামে-নি। হঠাৎ দীপকের কান্নার শব্দ শুনে ঘরের মধ্যে ঢুকে মা ও ছেলেকে সেইভাবে কাঁদতে দেখে একেবারে জ্বলে উঠ্‌লেন। তিনি দীপককে সুমনার আলিঙ্গন থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে তাঁর সামনে দাঁড় করিয়ে রেখে দিলেন।

সেদিন রাত্রে দীপক আর মার কাছে গল্প শোনবার আব্দার

ধরলে না। সুমনাকে কাঁদতে দেখে সে কেবল তাঁকে জড়িয়ে ধরে আস্তে-আস্তে ধরা-গলায় বল্লে—মা মা, মা-মণি।

সুমনা কান্না থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কি বাবা?

দীপক বল্লে—বাবা যখন আমায় মারবে তুমি আর আমাকে ধরতে যেও না মা।

ছেলের কথা শুনে সুমনা তাকে জড়িয়ে ধরে বল্লেন—তুমি ভাল ছেলে হও বাবা, তা হোলে বাবা আর মারবেন না।

সুমনা ছেলেকে আরও অনেক উপদেশ দিতে লাগ্লেন কিন্তু দীপকের কোনো সাড়া না পেয়ে দেখলেন যে, সে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমন্ত ছেলের কপালে চুমু খেয়ে তিনি ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

ব্যাপারটা কিন্তু এইখানেই শেষ হোলো না। পরদিনই বিশ্বমোহন ঠিকেদার ডেকে বাগানের এক কোনে ছোট এক খানা দোতলা বাড়ী তৈরী করবার হুকুম দিলেন। মাস দুয়েকের মধ্যেই বাড়ী তৈরি হোয়ে গেলে তিনি বিলেত থেকে মোটা মাইনে দিয়ে একজন ইংরেজ শিক্ষক এনে দীপককে তার হাতে সমর্পণ কর্লেন।

দীপককে সমস্তদিন সেই শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে থাকতে হোতো। বাড়ীর হদ্দোর মধ্যে থেকেও সমস্তদিন সে বাড়ীতে আসতে পেত না। রাত্রে একমাত্র ডিনার খাবার সময় ছাড়া বাড়ীতে আসবার তার হুকুম ছিল না। সমস্তদিন ধরে তার শিশু-হৃদয়ে অনেক অভাব ও অভিযোগ সঞ্চিত হোয়ে উঠ্ত

কিন্তু সে কথা কারুকে জানাবার অবসর তার আর ঘট্‌ত না।

এইভাবে বালক দীপকের শিক্ষা আরম্ভ হোলো। তার বালক-হৃদয় প্রথমে এই ব্যবস্থায় বিদ্রোহী হোয়ে উঠেছিল বটে কিন্তু সে তার বাবাকে যমের মতন ভয় করত। আর বালক হোলেও সে এটুকু বুঝতে পেরেছিল যে তার প্রতি এই কঠোর ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করবার শক্তি তার মার নেই। তাই সে এই ব্যবস্থাকেই ঘাড় পেতে মেনে নিলে।

ক্রমে বাড়ীতে থেকেই দীপক বাড়ীর সমস্ত বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হোয়ে পড়্‌তে লাগ্‌ল। তার পিতৃ-নিয়োজিত শিক্ষক মিঃ হোম্‌স্‌কে প্রথমত সে পিতার মতই কঠোর মনে করেছিল কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই মিঃ হোম্‌স্‌ তার বন্ধু হোয়ে দাঁড়ালেন।

দীপকের এই নতুন ব্যবস্থায় যে সুমনার আদৌ ইচ্ছা ছিল না সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু পুত্রকে শিক্ষাদান বিষয়ে তাঁর ইচ্ছা বা অনিচ্ছার প্রতি বিশ্বমোহন ভ্রূক্ষেপও কর্‌তেন না। ছেলেকে এমনভাবে ছাড়তে তাঁর কষ্ট হোলো বটে কিন্তু এই ব্যবস্থায় সন্তানের মঙ্গল হবে এই আশা তাঁর সমস্ত সন্তাপকে ঢেকে ফেল্লে।

বিশ্বমোহন তাঁর পরিবারের সমস্ত লোকের কাছে কঠোর হোলেও শান্তির কাছে ছিলেন নমনীয়। শান্তিকে তিনি মা

২

বলে ডাকতেন এবং বিনাবাক্যব্যয়ে তার সমস্ত আব্দার সহ্য করতেন।

দীপক ছিল শান্তির সঙ্গী। কিন্তু যেদিন থেকে তার অন্য বাড়ীতে থাকা ও অন্য শিক্ষকের কাছে পড়ার ব্যবস্থা হোলো সেদিন থেকে শান্তি বড় একা পড়ে গেল। কিছুদিন এই রকম একলা কাটাবার পর একদিন সে বিশ্বমোহনকে গিয়ে বল্লে—মামা আমি আর মিসেস্ য়্যাট্‌কিন্‌সনের কাছে পড়্‌ব না।

বিশ্বমোহন জিজ্ঞাসা করলেন—কেন মা?

মিসেস্ য়্যাট্‌কিন্‌সনের কাছে না পড়ার কারণ কিছুই ছিল না। বিশ্বমোহনের প্রশ্ন শুনে শান্তি একটু চুপ কোরে থেকে আবার বল্লে—আমিও দীপকের মাষ্টারের কাছে পড়্‌ব।

বিশ্বমোহন বল্লেন—ও এই কথা! আচ্ছা আমি কালই মিঃ হোম্‌স্‌কে বলে দেব তোমায় পড়াতে।

পরদিন সকালবেলা মিঃ হোম্‌স্ দীপককে পড়াচ্ছেন এমন সময় বিশ্বমোহন শান্তিকে নিয়ে গিয়ে বল্লেন—আমার এই ছোট মা-টিকে একটু কোরে পড়াতে হবে।

মিঃ হোম্‌স্ রোজ বিকেলে দীপককে নিয়ে গাড়ী চড়ে বেড়াতে যেতেন। শান্তি আব্দার ধরলে—সে-ও যাবে। শান্তির কাছে বিশ্বমোহনের 'না' ছিল না। তারও তাদের সঙ্গে বেড়াবার বন্দোবস্ত হোয়ে গেল।

এমনি কোরে শান্তিও যখন দীপকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে,

পড়াশুনা আরম্ভ করলে তখন সুমনা বাস্তবিকই বড় একলা পড়ে গেলেন। কিন্তু সুমনাকে বেশী দিন এই অবলম্বনহীন জীবন কাটাতে হোলো না। এই সময়, দীপক জন্মাবার প্রায় দশ বছর পরে বিশ্বমোহনের একটি মেয়ে হোলো। মেয়েকে পেয়ে সুমনা স্বামীকে বল্লেন—দেখ অনুকে মানুষ করবার ভার আমার ওপরে রইল। দীপককে যেমন আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছ অনুকে তেমনি নিতে পারবে না।

স্ত্রীর কথা শুনে বিশ্বমোহন হেসে বল্লেন—আচ্ছা গো আচ্ছা তাই হবে।

বছর কয়েক বাদে সুকুমার বিলেতে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়ে দেশে ফিরে এল। তখন তার বয়স সতেরো কি আঠারো। শান্তির বয়স তখন বড় জোর বারো।

সুকুমার দেশে ফিরেই বিশ্বমোহনের বাড়ীর হালচাল বদ্‌লে দিলে। সে ফশ্ কোরে সিগারেট কেস্ থেকে সিগারেট বের কোরে তার মামা মামীর সামনেই শোঁ শোঁ কোরে টানতে আরম্ভ কোরে দিলে। শুধু তাই নয়, বিশ্বমোহনের সামনেই খোলা সিগারেটের কেস্‌টা ধর্‌লে, অর্থাৎ এর থেকে নিয়ে তুমিও টানতে পার। দীপক তো ব্যাপার দেখে শিউরে উঠ্‌ল।

রাত্রে ডিনারের সময় সবার সাম্‌নেই সে বল্লে—মামী আমার শোবার যায়গা দীপকের বাড়ীতে হবে।

তারপর শান্তির দিকে আঙুল বাড়িয়ে বল্লে—এই খুকীর সঙ্গে এক বিছানায় শোয়া আমার দ্বারা হবে না।

লজ্জায় অভিমানে ও সঙ্কোচে শান্তির চোখে জল এসে গেল।

সুমনা সুকুমারের কথা শুনে বল্লেন—ঐ খুকীটিও তোমার সঙ্গে শুতে রাজী নয়। দীপকের বাড়ীতেই তোমার শোবার ব্যবস্থা হবে।

সুকুমারকে একটু আড়ালে পেয়ে দীপক বল্লে—দাদা, আজ বাবাকে একেবারে থ বানিয়ে দিয়েছ।

সুকুমার জিজ্ঞাসা করলে—কেন রে?

দীপক বল্লে—এই সিগারেট খাওয়া নিয়ে। বাড়ীতে এক মিঃ হোম্‌স্ ছাড়া আর কারুর সিগারেট খাবার হুকুম নেই।

সুকুমার আশ্চর্য্য হোয়ে বল্লে—বলিস্ কি রে! এযে সাগ্রে স্কুলেরও বাড়া। আমার অত পোষাবে না, আমি হোটেলে চলে যাব।

দীপক আবার বল্লে—কিন্তু দাদা বৌদিকে তোমার অমন করাটা উচিত হয়-নি।

সুকুমার বলে উঠল—চুপ কর্। বৌদি-বৌদি করিস্-নি। ঐ তো আমার লাইফ্‌টা মিজারেব্‌ল্ কোরে দিয়েছে।

দীপক অবাক হোয়ে জিজ্ঞাসা করলে—কেন দাদা?

সুকুমার চট্ কোরে দীপকের এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলে না। কিছুক্ষণ কেটে যাওয়ার পর সে বল্লে—বিলেত যেতিস্ তো বুঝতে পারতিস্? সেখানকার মেয়ে এক আর এখানকার মেয়ে এক—হুঁ!

দীপক সুকুমারের কথার কিছু বুঝলে কিছু বুঝলে না। কিন্তু সে কোনো উত্তর দিলে না।

সুকুমারের অশিষ্টতা দেখে বিশ্বমোহন অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন বটে কিন্তু সদ্য-বিলাত-প্রত্যাগত ভাগ্নে তাঁর ঘরের সমস্ত নিয়ম-কানুন নির্ব্বিচারে মেনে নেবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল বলে তিনি তাকে কিছু বল্লেন না।

মাস চার-পাঁচ রাজসাহী চালে কাটিয়ে সুকুমার অক্সফোর্ডে পড়বার জন্য আবার বিলেতে ফিরে গেল।

সুকুমার দ্বিতীয় বার বিলেতে যাবার বছর চারেক পরে শান্তি ও দীপক দুজনেই প্রাইভেটে এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা দিলে। তারা দুজনেই ভাল কোরে পাশ কর্‌লে। সুকুমার প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হোলো কিন্তু শান্তিকে বিশ্বমোহন আর কলেজে পাঠালেন না। অবিশ্যি কলেজে পড়বার জন্য শান্তির উৎসাহ দেখলে কি হোতো বলা যায় না কিন্তু সেদিকে শান্তিরও কোনো উৎসাহ দেখা গেল না। সে আরও মাস ছয়েক মিঃ হোম্‌সের কাছে পড়ে একদিন বই-টই তুলে রেখে দিলে। বিশ্বমোহন মোটা রকমের পুরস্কার দিয়ে দীপক ও শান্তির শিক্ষক মিঃ হোম্‌সকে দেশে পাঠিয়ে দিলেন।

মিঃ হোম্‌স্ দেশে ফিরে গেলেন বটে কিন্তু দীপক আর বাড়ীতে ফির্‌ল না। এই ক'বছরের ব্যবধানে গৃহ বল্‌তে যা বোঝায় তা থেকে সে তো অনেকখানি সরে গিয়েছিলই উপরন্তু শান্তিকেও অনেকখানি তার বাড়ীর দিকেই টেনে নিয়েছিল। বাগানের কোনে তাকে উপলক্ষ্য কোরে যে বাড়ী তৈরী হয়েছিল সেই বাড়ীই তার বাড়ী হোয়ে দাঁড়াল। এইখানেই তার শোয়া, বসা, পড়া, আড্ডা দেওয়া সবই চল্‌তে লাগ্‌ল। মাষ্টার থাক্‌তে রাত্রে ডিনার খাবার সময় তাকে বাড়ী যেতে হোতো কিন্তু এখন থেকে সে এই বাড়ীতেই খাবার আনিয়ে খেতে লাগ্‌ল।

সেবার আশ্বিন মাস পড়্‌তে না পড়্‌তে স্বদেশীর প্লাবনে বাংলার বুক টল্‌মল্ কোরে উঠ্‌ল। এই বন্যায় কম-বেশী সকলেই ভেসে চল্‌ল বটে কিন্তু স্রোতের মুখে তৃণের মত যারা ভাস্‌তে পারে—সেই তরুণের দল এই প্লাবনের মুখে গা ভাসিয়ে দিলে। বিশ্বমোহন নিজে এই সব রাজনীতিক হাঙ্গামায় যোগ তো দিতেনই না, এবং বিশেষ কোরে ছেলেদের এই সব

ব্যাপারে যোগ দেওয়াটাকে তিনি অত্যন্ত অপছন্দ করতেন। দীপক [illegible] থেকেই কোট প্যাণ্টলুনে অভ্যস্ত হোয়ে উঠেছিল এবং সেই বেশেই সে কলেজে যেত। একদিন বিশ্বমোহন দেখলেন যে দীপক ধুতি চাদর পরে কলেজে যেতে আরম্ভ করেছে। স্বদেশীর বন্যাই যে ছেলের অঙ্গ থেকে কোট প্যাণ্টলুন ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে সে বিষয়ে তাঁর আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না। তিনি দীপককে একদিন ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—সং সেজে কলেজে যাচ্ছ কেন?

দীপক বল্লে—এই সংয়ের বেশেই আমাদের ভাল মানায় বলে।

দীপকের এই ব্যবহারে বিশ্বমোহন অত্যন্ত দুঃখিত এবং অসন্তুষ্ট হোলেও মুখ ফুটে সেদিন তাকে কিছু বল্‌তে পারলেন না। দীপক কলেজে ঢোকার পর সে নিজেই ষোলআনা নিজের মালিক হয়েছিল। বিশ্বমোহন তাঁর নিজের কোনো নিয়ম তার ওপরে আরোপ করতেন না।

দুটো বছর এমনি কোরে কেটে গেল। দীপক এফ এ পাশ কোরে বি, এ ক্লাসে উঠ্‌ল। দীপকের চাল-চলন দেখে বিশ্বমোহন মনে করেছিলেন যে পরীক্ষায় সে ফেল হবে। কিন্তু সে পাশ হওয়ায় তিনি আশাতীত রকমের খুশী হলেন। সেদিন তিনি স্ত্রীকে ডেকে বল্লেন—সুমনা, ওর বনেদ এমন পাকা কোরে দিয়েছি যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা তো ছার, জীবনের কোনো পরীক্ষাতেই ও আর ফেল হবে না। এ তুমি দেখে নিও।

দীপক পরীক্ষায় পাশ হওয়ায় সুমনাও খুব আনন্দিত হয়েছিলেন। মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত কোরে দীপক[illegible] সেই কঠোর আবহাওয়ার মধ্যে ফেলে দেওয়ায় সুমনার মনে ক্ষোভের সীমা ছিল না। তবুও এই আনন্দের সময় তিনি স্বামীর ব্যবস্থায় সহানুভূতিই জানালেন।

দীপক বি এ পড়্‌তে লাগ্‌ল। ছেলে সম্বন্ধে বিশ্বমোহন আর কোনো ভাবনা ভাবতেন না বল্লেই চলে। তিনি ঠিক কোরে রেখেছিলেন যে বি এ পাশ করলেই দীপককে বিলেতে পাঠিয়ে ব্যরিষ্টার কোরে আনবেন। তাঁর ভাগ্নে সুকুমারও তখন বি এ পাশ কোরে ব্যারিষ্টারী পড়্‌ছিল। সুকুমার এলেই দীপক যাবে এই ঠিক ছিল। সংসার বেশ শৃঙ্খলাতেই চল্‌ছে এমন সময় অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে একটি দুর্ঘটনা ঘটে তাঁর মনের সমস্ত শান্তি নষ্ট কোরে দিলে।

বিশ্বমোহন প্রত্যহ প্রত্যুষে উঠে প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে নিজের বাগানে পায়চারী করতেন। একদিন সকালবেলা বাগানে নেমে তিনি দেখতে পেলেন যে, বাড়ীর চারদিক পুলিশে ঘেরাও করেছে। ব্যাপার কি তা জানবার জন্য তিনি তাড়াতাড়ি গেট খুলে একজন কর্ম্মচারীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—এ সব কি?

কর্ম্মচারী বল্লে—আমরা প্রায় সারারাত্রি এইখানে পাহারা দিচ্ছি। আপনার বাড়ী খানাতল্লাসী করবার আর আপনার ছেলে দীপক মিত্রকে গ্রেপ্তার করবার পরোয়ানা আমার কাছে আছে।

বিশ্বমোহন [illegible] কোরে পুলিশ কর্ম্মচারীর কথাগুলো ধরতে পারলে[illegible] তাঁর মনে হোতে লাগ্‌ল যেন পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। কোনো রকমে নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—কি অপরাধে শুনতে পারি কি?

কর্ম্মচারীটি হেসে বল্লেন—রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও নরহত্যার অপরাধে।

ক্রোধে বিশ্বমোহনের ধমনীতে যেন অগ্নিপ্রবাহ সুরু হোলো। কিন্তু কি করবেন, করবার কিছুই নেই। রাগ চেপে পুলিশের দারোগাকে বল্লেন—আপনি সচ্ছন্দে বাড়ী খানাতল্লসী করুন।

পুলিশ কর্ম্মচারী আগেই সাক্ষী হবার জন্য পাড়ার জনকয়েক লোক ডেকে এনেছিল। সে তাঁদের নিয়ে বাড়ীতে ঢুকে বল্লে—যতক্ষণ আমরা না যাই ততক্ষণ বাড়ী থেকে যেন কেউ না বেরোয়। আপনি সবাইকে এ কথা বলে দিন।

রাগে কাঁপতে-কাঁপতে বিশ্বমোহন তাকে বল্লেন—কারুকে কিছু বলতে হবে না। যদি কেউ বের হয় আপনি তাকে যা ইচ্ছা হয় তাই করবেন। এখন চলুন যে কাজে এসেছেন তাই সারবেন।

দারোগা অগ্রসর হোতে-হোতে বল্লে—আপনার ছেলে দীপক বাবুর ঘরখানা কোথায়? আগে আমাদের সেইখানে নিয়ে চলুন।

পুলিশের লোকজন নিয়ে বিশ্বমোহন দীপকের বাড়ীতে গিয়ে উঠ্‌লেন। চাকরকে হুকুম দিলেন—দীপককে ডেকে দাও।

চাকর বল্লে—দীপক বাবা বাড়ীতে নেই।

—কোথায় গিয়েছে ?

—তা তো জানি না। কাল সন্ধ্যার সময় খেয়ে বেরিয়ে গেছেন।

পুলিশ কর্ম্মচারীটি এবার বিশ্বমোহনের দিকে চেয়ে একটু হেসে খানাতল্লাস স্থরু করলেন।

বাড়ী খালাতল্লাস কোরে পুলিশ অনেক চিঠিপত্র নিয়ে চলে গেল। বিশ্বমোহন এতক্ষণ বাড়ীর কারুর সঙ্গে একটা কথা পর্য্যন্ত বলেন-নি। পুলিশের লোকেরা চলে যাওয়ার পর তিনি দীপকের চাকরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—দীপক বাবা এর আগে রাত্রে কখনো বাড়ী আসে-নি এমন হয়েছে ?

চাকর বল্লে—হ্যাঁ।

—কবে ?

—দীপক বাবা তো প্রায় রোজই বাইরে যায়, খুব ভোর বেলা ফিরে আসে।

বিশ্বমোহনের মনে হোতে লাগ্‌ল তিনি যেন আরব্য উপন্যাসের এক অপূর্ব্ব কাহিনী শুনছেন। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হোয়ে বসে থেকে হঠাৎ তিনি দীপকের চাকরকে মারতে উদ্যত হলেন—এ কথা এতদিন আমায় বলিস্‌-নি কেন ?

বিশ্বমোহন চাকরকে প্রহার করতে উদ্যত দেখে স্থমনা বল্লেন—আর ওকে মেরে কি হবে, ওকে যেতে দাও।
চাকরের যে কোনো দোষ নেই তখুনি সে কথা বুঝতে পেরে

বিশ্বমোহন আবার বসে পড়লেন। কিন্তু রাগে তাঁর সর্ব্বাঙ্গ কাঁপতে লাগল। সুমনা স্বামীর কাছে এসে দাঁড়ালেন। তাঁদের এই আকস্মিক বিপদে তিনিও কম বিচলিত হন-নি। কি কোরে এই সব কাজ দীপকের দ্বারা সম্ভব হোলো তা তিনি ভেবে ঠিক করতে পারছিলেন না। স্বামী ও স্ত্রী নির্ব্বাক হোয়ে বসে রইলেন ও মধ্যে-মধ্যে পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগ্‌লেন।

চাকর এসে সংবাদ দিলে যে, তাঁদের প্রতিবাসী অমূল্যবাবুর বাড়ীতেও পুলিশ খানাতল্লাসী করেছে আর অমূল্যবাবুর ছেলে দীপক বাবার বন্ধু অবনীবাবুকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে। ঘণ্টা দুয়েক বাদে সংবাদ পাওয়া গেল যে, কলকাতা শহরের আর এক প্রান্তে এক বাগানে পুলিশ অনেকগুলি যুবককে গ্রেপ্তার করেছে। বেলা দুটো নাগাদ সংবাদ পাওয়া গেল দীপক ধরা পড়েছে। সে ও তার কয়েকজন বন্ধু শহরের একটা বাড়ীতে লুকিয়েছিল পুলিশ গিয়ে সেই বাড়ী ঘেরাও করে। সেখানে পুলিশের সঙ্গে তাদের ছোটখাট রকমের একটা যুদ্ধও হোয়ে গিয়েছে। শেষ-কালে কোনো দিক দিয়ে পালাতে না পেরে তারা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে।

বিশ্বমোহন এতক্ষণ গুম্ হোয়ে বসেছিলেন। দীপকের গ্রেপ্তার-সংবাদ পেয়ে তিনি পোষাক পরে বেরিয়ে গেলেন।

সেদিন বাড়ীতে সুমনা ও শান্তি কারুর খাওয়া হোলো না। মাঝে-মাঝে দীপকের কার্য্যকলাপ নানারকম সম্ভব-অসম্ভব কাহিনী জড়িয়ে নিয়ে তাঁদের কাছে এসে উপস্থিত হোতে

লাগ্‌ল। তাঁরা কিছুদিন থেকে এই সব বিপ্লবপন্থীদের কথা শুনে আসছিলেন কিন্তু এদের কার্য্যকলাপ ক খনো অনুমোদন করেন-নি। এদের সম্বন্ধে আলোচনার সময় দীপকও ছু-এক দিন উপস্থিত ছিল, তার কথা শুনেও মনে হোতো যে, সে-ও তাদের কাজের অনুমোদন করে না। সে যে এতদিন এমনভাবে আত্ম-গোপন কোরে তাঁদের প্রতারণা করেছে এ কথাটা সুমনা কিছু-তেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তিনি শান্তিকে জিজ্ঞাসা করলেন—বৌমা, একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ব, আমি কারুকে বল্‌ব না।

শান্তি জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কি কথা?

সুমনা বল্লেন—দীপক তোমাকে এ-সব সম্বন্ধে কোনো কথা কখনো বলেছে—

শান্তি বল্লে—কৈ না। আমাকে কখনো কিছু বলে-নি।

সন্ধ্যার সময় বিশ্বমোহন বাড়ীতে ফিরে এলেন। সুমনা ও শান্তি এতক্ষণ তাঁরই পথ চেয়ে বসেছিলেন। তিনি আস্‌তে না আস্‌তে সুমনা জিজ্ঞাসা করলেন—হ্যাঁগা কি হোলো?

বিশ্বমোহন হতাশভাবে একটা কৌচে বসে বল্লেন—ছাড়্‌লে না। হতভাগাকে কিছুতেই ছাড়্‌লে না।

সুমনা ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—তবে যা শোনা যাচ্ছে—

—সব সত্যি। হতভাগা শেষকালে ঐ দলে গিয়ে জুটল।

ক্ষোভে ও রোষে বিশ্বমোহনের কণ্ঠরুদ্ধ হোয়ে এল। একটু

চুপ কোরে থেকে মন থেকে সমস্ত ব্যাপারটাকে ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা কোরে তিনি বল্লেন—চল খেতে চাই। সমস্ত দিন কিছু খাই-নি।

দীপককে জামিনে খালাস করবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করা হোলো কিন্তু তার বিরুদ্ধে নাকি এমন সব প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল যে জামিনে তাকে ছেড়ে দেওয়া যায় না। এই ব্যাপারের সংশ্রবে প্রায় ত্রিশ পয়ত্রিশজন যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। মাস দেড়েক খানাতল্লাসী ও ধর-পাকড়ের পর বিচার আরম্ভ হোলো।

তিন বৎসর পরে দীপকদের বিচারপর্ব্ব শেষ হোলো। বিচারে কারুর ফাঁসী, কারুর দ্বীপান্তর, কারুর জেল হোলো। কেউ-কেউ বা মুক্তিও পেলে। বিশ্বমোহন যদিও বলেছিলেন যে, অমন ছেলের যা হবার তাই হবে তার জন্য কিছু করবেন না। কিন্তু শেষে তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞা রাখতে পারেন-নি। এই কয় বছর শয়নে-স্বপনে দীপকের চিন্তায় তাঁর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়েছিল। অজস্র অর্থব্যয় ও নানারকম তদারকের ফলে দীপকের দোষ সপ্রমান না হওয়ায় সে মুক্তি পেয়ে গেল।

তিন বছর পরে দীপক যখন বাড়ী ফিরে এল তখন তার মা, বাপ, বৌদি, বোন ও সংসারের সকলেই বুঝতে পারলে এ লোক যেন সে লোক নয়। বাড়ীর মধ্যে একমাত্র শান্তি ছাড়া আর কারুর কাছে তার মন খুল্‌ত না বটে কিন্তু তার স্ফূর্ত্তি ছিল

অফুরন্ত। তার ছোট্ট বাড়ী সর্ব্বদাই বন্ধু-বান্ধবের আড্ডায় জমজম্ করত আর তার মধ্যে দীপকের গলা সবার গলাকে ছাড়িয়ে উঠত। হাজত থেকে ফিরে এসে দীপক আবার তার সেই বাড়ীতে এসে ঢুক্‌ল। তার অবর্ত্তমানে তার ঘর, জিনিষপত্র শান্তি এই ক'বছর পরিচ্ছন্ন রেখেছিল। সে ফিরে আসার পরও শান্তি তার অবসাদগ্রস্ত মনকে আবার চাঙ্গা কোরে তোলবার চেষ্টায় মন দিলে।

৫

বালীগঞ্জে বিশ্বমোহনের বাড়ী থেকে একটু দূরে একখানি কুঞ্জঘেরা সুন্দর বাড়ীতে বাস করতেন অমূল্যরতন চৌধুরী। এই অমূল্যবাবুরা ছিলেন কোথাকার জমিদার। শুধু জমিদার বল্লে ভুল হবে, কারণ অমূল্যবাবুর বাবা বিষয়ের অর্দ্ধেকখানি বাঁধা দিয়ে রাজা খেতাব পেয়েছিলেন। পিতা রাজা ছিলেন বলে অমূল্য নিজের নামের আগে কুমার ব্যবহার করতেন। সুখের বিষয় অমূল্যবাবু নিজে রাজা খেতাবের জন্য কখনো লালায়িত হন-নি, বরং বাবার রাজসম্মান ও রাজকীয় চালচলন বজায় রাখতে যে বিষয়টুকু তাঁদের প্রায় যায়-যায় অবস্থায় দাঁড়িয়েছিল নিখরচার কুমার থেকে তিনি সেই বিষয়ের প্রায় অনেকখানি উদ্ধার করেছিলেন। এই অমূল্যবাবুর পরিবারের সঙ্গে বিশ্বমোহনদের পরিবারের বন্ধুত্ব ক্রমে আত্মীয়তায় পরিণত হয়েছিল।

বিশ্বমোহনের মত অমূল্যও বলেছিলেন যে, তিনি তাঁর পুত্র অবনীর মুক্তির জন্য কোনো চেষ্টাই করবেন না। কিন্তু বিশ্বমোহন পরে মত বদ্‌লালেও অমূল্যর প্রতিজ্ঞা অটল রইল।

অমূল্যকে সরকারী কোন এক উচ্চ কর্ম্মচারী নাকি সংবাদ দিয়েছিল যে, রাজদ্রোহী পুত্রের কোনো রকম সহায়তা করলে তাঁর বিষয় কেড়ে নেওয়া হবে।

পুত্রের মুক্তিলাভের কোনো চেষ্টা অমূল্য করছেন না দেখে তাঁর স্ত্রী, অবনীর মা এসে বিশ্বমোহনকে ধরলেন এবং স্বামীর অজ্ঞাতে বিশ্বমোহনকে দিয়ে তার মুক্তির চেষ্টা করতে লাগ্‌লেন। কিন্তু অনেক চেষ্টা করা সত্ত্বেও অবনী মুক্তি পেলে না। তবে তার প্রতি ফাঁসীর হুকুম না হোয়ে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের হুকুম হোলো।

কলেজে পড়বার সময় দীপক মাসিক পত্রাদিতে গল্প, উপন্যাস, কবিতা প্রভৃতি লিখ্‌ত। সাহিত্য-সাধনার দিকে তার খুব ঝোঁক না থাকলেও সময় পেলেই সে লেখবার চেষ্টা করত। এ বিষয়ে তার প্রধান উৎসাহদাতা ছিল কুমার অমূল্য চৌধুরীর ছেলে অবনী। অবনী নিজে ছিল চিত্রকর। শুধু চিত্রকর বল্লেই তার পরিচয় শেষ হয়-না, সে ছিল ভাল চিত্রকর। এই অল্পবয়সেই দেশের লোকেরা তার প্রতিভার পরিচয় পেয়েছিল। এই সব কারণে অবনী ও দীপক যে শুধু বন্ধু ছিল তা নয়, তাদের উভয়ের অন্তরতম অন্তরের মধ্যে এমন একটা ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল যেটা তারা নিজেরাই সব সময়ে বুঝতে পারত না।

দীপকদের বিচার-পর্ব্ব শেষ হবার পরে রায় দেবার আগেই তারা কার যে কি হবে তার অনেকটা আন্দাজ কোরে নিয়েছিল। হাজতের শেষ দিনে অবনী দীপককে আলিঙ্গন কোরে

বল্লে—আমার তো ফাঁসি হবে জানি। যদি ফাঁসি না হয় তা হোলে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর তো নিশ্চয়। মাকে বলিস্ আমি তাঁর অধম সন্তান—

অবনীর কণ্ঠ রুদ্ধ হোয়ে এল, সে আর কিছু বল্‌তে পারলে না। অবনীর বাবা যে তাকে বাঁচাবার কোনো রকম চেষ্টাই করেন-নি এ কথা দীপকরা সবাই জান্‌ত। দীপকও অবনীর কথার কোনো জবাব দিতে পারলে না।

দীপক বাড়ীতে এসেই শুনলে যে, অবনীর মা ছেলের দ্বীপান্তরের সংবাদ পেয়ে সেই যে বিছানায় শুয়েছেন এখনো ওঠেন-নি। সংবাদটা পেয়েই সে অবনীর মার সঙ্গে দেখা কর্‌বে বলে ঠিক করেছিল কিন্তু শান্তি ও অনুর কাছে সে খবর পেলে যে তার সেখানে যাওয়াটা অমূল্যবাবু মোটেই পছন্দ করবেন না। দীপক দেখলে অসম্ভব কিছুই নয়। যে ব্যক্তি রাজদ্রোহ অপরাধে অভিযুক্ত পুত্রকে অনায়াসে ফাঁসীর মুখে ছেড়ে দিতে পারে, সে ব্যক্তি তার মতন লোককে বাড়ীতে ঢুক্‌তে দিতে আপত্তি কর্‌বে বৈকি।

দীপক সাহিত্য সাধনায় মন দিলে। সে বাইরে বেরুত না, বাড়ীর মধ্যে থেকেও হয়ত সপ্তাহে একদিন কি দু-দিন তার বাবা মার সঙ্গে দেখা হোতো। এই সাধনায় তার উৎসাহদাত্রী হোলো শান্তি। নিজের একান্ত প্রয়োজন ও রাত্রে ঘুমের সময় ছাড়া সব সময়েই সে দীপকের কাছে থেকে তাকে সেবা ও সাহচর্য্য

দিয়ে তার মুষ্‌ড়ে-পড়া মনটাকে চাঙ্গা কোরে তোলবার চেষ্টা করতে লাগল।

একদিন, রাত্রি তখন আটটা। দীপক ঘরের মধ্যে একলা বসে আছে এমন সময় তার ঘরের সামনে অন্ধকার বারান্দায় কে এসে দাঁড়াতেই দীপক জিজ্ঞাসা করলে—কে ?

কোনো উত্তর না পেয়ে দীপক মনে করলে, বোধ হয় তার বোন অনু এসেছে। সন্ধ্যের পর অনু মাঝে-মাঝে তার মার শাসন-বন্ধন ছিঁড়ে তার দাদার ঘরে গল্প করবার জন্য পালিয়ে আসত। দীপক ডাকলে—অনু দাঁড়িয়ে রইলি কেন, ভেতরে আয়।

ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর এল—আমি অনু নই।

—অনু নয়, তবে কে ?

দীপক উঠে বাইরে গিয়ে দেখলে বারান্দায় একটি কিশোরী দাঁড়িয়ে। অন্ধকারে ভাল কোরে তার মুখ দেখা যাচ্ছিল না। সে একবার তার মুখখানা দেখবার চেষ্টা কোরে বল্লে—কে ?

মেয়েটী এবার বল্লে—দীপ-দা আমায় চিনতে পাচ্ছ না ? আমি স্বাতী।

—স্বাতী ! তা এখানে দাঁড়িয়ে কেন ? এস এস ভেতরে এস !

স্বাতী অবনীর বোন। দীপকরা যখন ধরা পড়েছিল তখন তার বয়স ছিল এগারো কি বারো। এই তিন চার বছরের মধ্যে সে অনেকখানি বড় হোয়ে গিয়েছিল, তাই প্রথম দৃষ্টিতে দীপক তাকে চিনতে পারে-নি।

স্বাতীকে ঘরের মধ্যে নিয়ে এসে দীপক জিজ্ঞাসা করলে—কি স্বাতী ব্যাপার কি? এত রাত্রে!

স্বাতী বল্লে—তোমাকে দেখতে এলুম দীপ-দা। তুমি তো আমাদের দেখতে গেলে না। প্রায় ছ-মাস হোলো এসেছ—

দীপক বল্লে—এসেই আমি মাসীমাকে দেখতে যাব ঠিক করেছিলুম, কিন্তু শুনলুম যে তোমার বাবা নাকি সেটা পছন্দ করবেন না। তাই—

স্বাতী বল্লে—তুমি ঠিকই শুনেছ। সেই জন্যই তো এত রাত্রে তোমার কাছে এসেছি—বাবা যাতে না জানতে পারেন।

দীপক বল্লে—কি ব্যাপার বল তো?

—মা তোমাকে ডেকেছেন।

—তোমার বাবা কিছু বল্‌বেন না তো?

—মা বলেছেন যে, বাবা যাই বলুন না কেন তোমায় যেতেই হবে। মা দাদার কথা জিজ্ঞাসা করবেন।

দীপক একটু ভেবে বল্লে—আচ্ছা যাব।

আরও কিছুক্ষণ গল্প হবার পর স্বাতী বল্লে—আমি যাই দীপ-দা। বেশী রাত্রি হোলে মা আবার ভাববেন।

দীপক বল্লে—আচ্ছা যাও। আমি কাল বিকেলে যাব'খন। চাকর-বাকর কেউ সঙ্গে আছে, না একলাই এসেছ?

—একলাই এসেছি—বলে স্বাতী উঠে পড়্‌ল।

দীপক বল্লে—চল তোমাকে পৌছে দিয়ে আসি।

পরদিন দীপক অবনীর মাকে দেখতে গেল। তিনি অসুস্থ ছিলেন। দীপককে দেখে কাঁদতে আরম্ভ করলেন। কিছুক্ষণ কান্নাকাটির পর তিনি অবনীর কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন।

অবনী তার বাপ-মায়ের একমাত্র পুত্র ছিল। এই এক মাত্র পুত্রকে আর কখনো দেখতে পাবেন না, সে কোন সুদূর আন্দামানে ঘানি টান্‌ছে, পাথর ভাঙছে অথবা সমুদ্রের জল সিদ্ধ কোরে নুন তৈরি কর্‌ছে—একথা তার মা সত্যবালার যখনি মনে হয় তখনি তিনি আর কান্না থামাতে পারেন না। একেই তাঁর শরীর কোনো কালেই ভাল ছিল না, তার ওপরে অবনীর এই শাস্তি এবং তার মোকদ্দমার সময় তাঁর স্বামীর সেই অবহেলার ভাব তাঁকে মনঃপীড়ায় শয্যাশায়ী কোরে ফেলেছিল। দীপক দেখলে অবনীর প্রসঙ্গে তিনি ক্রমেই কাতর হোয়ে পড়ছেন। সে তাড়াতাড়ি অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপিত কর্‌লে।

সেদিন ওঠবার সময়ে সত্যবালা বল্লেন—তুই রোজ একবার আমার কাছে আসিস্ বাবা। তোকে দেখে তবুও অবনীর কথা কিছুক্ষণ ভুলতে পার্‌ব।

দীপক সেদিন থেকে নিয়মিতরূপে অমূল্যবাবুদের বাড়ীতে যেতে আরম্ভ কর্‌লে। প্রত্যহ সেই সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি ঘরে বসে থেকে-থেকে তাঁর জীবনটাও হাঁপিয়ে উঠছিল। তাই সে অমূল্যবাবুর রোষ ও আপত্তি সত্ত্বেও তার একঘেয়ে জীবনের মাঝে এই বৈচিত্র্যটুকুকে সাদরে বরণ কোরে নিলে।

এই রকমে কিছুদিন যায়। একদিন দীপক শান্তিকে বল্লে—বৌদি, আমি মনে কর্‌ছি এইখানকার, এই পল্লীর ছোটলোকদের ছেলে-মেয়েগুলার জন্য একটা স্কুল কর্‌ব। তুমি যদি আমায় সাহায্য কর তা হোলে হয়।

কথাটা শুনেই শান্তি বল্লে—কর না, ঠাকুরপো। বসে, ঘুমিয়ে খেয়ে তো আর দিন কাটে না। আমি মনে করছিলুম আর কিছু না হয় তো কলেজে গিয়ে ঢুক্‌ব।

দীপক বল্লে—দেখ না, ছেলে-মেয়েগুলো দিনরাত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে মারামারি কোরে কাটাচ্ছে। এদের যদি যত্ন কোরে শিক্ষা দেওয়া যায় তো দেশের একটা বড় কাজ হয়।

শান্তি দীপকের চেয়েও উৎসাহিত হোয়ে উঠ্‌ল। এ কাজের জন্য প্রথমে কত টাকা খরচ হবে, কাকে-কাকে এর মধ্যে নেওয়া হবে দুজনে ক'য়দিন ধরে তার হিসাব ও পরামর্শ চল্‌তে লাগ্‌ল।

দীপক বল্লে—কিন্তু ইস্কুলের জন্য একটা বাড়ী কিংবা অন্তত দু-তিন খানা ঘর তো চাই?

শান্তি বল্লে—বাড়ীর ভাবনা কি! তোমার এই বাড়ীর এক তলায় স্কুল হবে। কেন তোমার কি তাতে অসুবিধা হবে?

দীপক বল্লে—মামার অসুবিধা কিছু হবে না। কিন্তু বাবা কি ও-সব হাঙ্গামা এখানে করতে দেবেন ?

শান্তি বল্লে—সেজন্য তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না। আমি মামাকে বলে সব ঠিক কোরে নেব।

দীপক জানত যে, শান্তিকে তার বাবার অদেয় কিছুই নাই। সে বল্লে—দেখ বৌদি, এর জন্য আমাদের উঠে-পড়ে লাগ্‌তে হবে কিন্তু। এই হবে আমাদের জীবনের সাধনা। এই ইস্কুলকে আমরা একদিন মস্ত-বড় একটা জাতীয় প্রতিষ্ঠানে দাঁড় করাব।

উৎসাহে শান্তির চোখ জ্বল্-জ্বল্ করতে লাগ্‌ল। দীপক আবার বল্লে—আজই তা হোলে বাবার কাছে কথাটা পাড়্‌বে।

সেই রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর শান্তি বিশ্বমোহনকে বল্লে—মামা, এ পাড়ার ছোট-ছোট ছেলে-মেয়ে যারা পয়সার অভাবে শিক্ষা পায়-না তাদের জন্য আমরা একটা স্কুল করব মনে করেছি। আপনাকে আমাদের সাহায্য করতে হবে।

বিশ্বমোহন বল্লেন—বেশ তো মা-জননী। আমাকে যা করতে বল্‌বে আমি তাই করব।

শান্তি বল্লে—দীপকের বাড়ীর এক তলাটা ইস্কুলের জন্য ছেড়ে দিতে হবে। আর ইস্কুলের চেয়ার বেঞ্চি ইত্যাদির প্রথম খরচটা আপনাকে দিতে হবে।

বিশ্বমোহন বল্লেন—বেশ। কত খরচ হবে একটা হিসাব করেছ ?

—হ্যাঁ, হিসাবটা দীপকের কাছে আছে।

দীপকের নাম শুনেই বিশ্বমোহন অপ্রসন্ন হোয়ে পড়লেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—তোমরা কে কে এই কাজে আছ?

শান্তি কয়েকজন ছেলে-মেয়ের নাম করলে। বিশ্বমোহন তাদের সকলকেই চেনেন। কিছুক্ষণ চুপ কোরে থেকে তিনি বল্লেন— ইস্কুল করবার জন্য ও-বাড়ীর সমস্তটাই আমি ছেড়ে দিচ্ছি কিন্তু এর মধ্যে তোমরা দীপককে নিও না।

বিশ্বমোহনের কথা শুনে শান্তির উজ্জ্বল মুখখানা ম্লান হোয়ে গেল। সে আর কোনো কথা না বলে সেইখানে চুপ কোরে দাঁড়িয়ে রইল। দীপককে তাদের এই কাজের মধ্যে নিতে বারণ করায় শান্তি যে ক্ষুণ্ণ হয়েছে তা বুঝতে পেরে বিশ্বমোহন বল্লেন— দীপককে তোমাদের মধ্যে রাখ্‌লে স্কুল কিংবা দীপক কারুরই ভাল হবে না। এখন ওর সমস্ত বিষয় থেকে আল্‌গা থাকাই ভাল।

শান্তি দীপকের কাছে সমস্ত খুলে বল্লে। দীপক তার বাবার কথা শান্তির মুখে শুনে বল্লে—বেশ তো বৌদি, তোমরাই তা হোলে কর। কাজ হোলেই হোলো। আমি না হয় না-ই থাকলুম।

শান্তি বল্লে—ধ্যেৎ, তোমাকে বাদ দিয়ে আমি কোনো কাজ করতে চাই না।

আবার দীপক ও শান্তির সেইভাবে দিন কাটতে লাগল। দীপক লিখে শান্তিকে পড়িয়ে শোনায়। প্রশংসায় শান্তি পঞ্চমুখ

হোয়ে উঠে। মাসিক পত্রে দীপকের লেখা বেরুলে শান্তি এসে খবর দেয়—ঠাকুর পো, তোমার সেই লেখাটা বেরিয়েছে—

একদিন সত্যবালা দীপককে জিজ্ঞাসা করলেন—হ্যাঁরে তোরা যে ইস্কুল করছিলি তার কি হোলো?

দীপক বল্লে— সে হোলো না মাসিমা।

—কেন রে?

—বাবা চান না যে আমি ও-সবের মধ্যে থাকি।

দীপকের ধীর-গম্ভীর কণ্ঠস্বরের পশ্চাতে যে বেদনা লুকিয়েছিল সত্যবালা তখুনি তা বুঝতে পারলেন। দীপকের বাবার কঠোর শাসনের কথা তাঁর অবিদিত ছিল না। তাঁর নিজের ছেলেকেও পিতার কঠোর শাসনের চাপে মানুষ হোতে হয়েছিল বলে দীপকের প্রতিও তাঁর স্নেহ ও মমতা পুত্রের মতনই বেড়ে উঠেছিল। তিনি দীপকের কথার কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ কোরে পড়ে রইলেন। কিছুক্ষণ পরে বল্লেন—দীপক তুই স্বাতীকে একটু কোরে পড়া না বাবা। ও যে কি পড়ে কেউ জানে না। ওর বাবাও দেখেন না আর আমি তো এইভাবে পড়ে আছি।

দীপক বল্লে—বেশ তো মাসিমা তার জন্য কি। আমি কাল থেকে ওকে পড়াব।

স্কুল হোলো না বটে, কিন্তু দীপক সেইদিন থেকে স্বাতীকে ছাত্রীরূপে পেলে। সে দু-বেলা তাকে পড়াতে আরম্ভ কোরে দিলে।

দীপকের জীবনে আর একটু বৈচিত্র্য এল।

একদিন শীতের দ্বিপ্রহরে দীপক তার ঘরের চুপ কোরে একলা বসে আছে এমন সময় শান্তি ঘরে এসে হাসতে-হাসতে তাকে বল্লে—কি ঠাকুর পো, বেশ ভাই বেশ! নতুন সঙ্গী পেয়ে যে সব ভুলে গেলে।

শান্তির রহস্যের মধ্যে যে ইঙ্গিত ছিল দীপক সেটা বুঝতে পেরেও যেন কিছুই বুঝতে পারে-নি এই রকম একটা বিস্ময়ের ভাব মুখের ওপরে এনে জিজ্ঞাসা করলে—নতুন সঙ্গী! সে আবার কে?

শান্তি দীপকের সমবয়সী হোলেও সম্পর্কে যে বড় সে কথা সে নিজে বুঝতে না পারলেও সুমনা ও বিশ্বমোহন মাঝে-মাঝে তাকে বুঝিয়ে দিতেন। দীপক কিছুতেই শান্তিকে প্রণাম করতে চাইত না। কোথাও যাবার সময় সুমনা যখন দীপককে ডেকে শান্তিকে প্রণাম করতে বলতেন তখন বৌদিকে তার প্রাপ্য সম্মান দিতে এবং শান্তিরও সে সম্মান গ্রহণ করতে বাধ্‌ত। এই নিয়ে সুমনা ও বিশ্বমোহনের আড়ালে শান্তি ও দীপকে যে কত হাসাহাসি হয়েছে তার ঠিকানা নেই। শান্তিও মাঝে মাঝে ঠাট্টা কোরে দীপককে অপ্রস্তুত করবার জন্য গুরুজনদের সম্মুখে বেশ মুরুব্বীয়ানাও কোরে নিত। কিন্তু অন্তরে-অন্তরে তারা দুজনে ছিল বন্ধু। একথা শান্তি ও দীপক দুজনেই জান্‌ত।

দীপকের কথা শুনে শান্তি সেই রকম মুরুব্বীয়ানা চালে

বল্লে—দেখ আমার সঙ্গে চালাকী কোরো না। আমি কিছু বুঝি না, না?

দীপক হাসতে-হাসতে বল্লে—কি বুঝেছ?

শান্তি বল্লে—যা বুঝেছি বল্‌ব?

—বল বৌদি বল।

—তুমি স্বাতীকে ভালবাস।

দীপক বল্লে—দূর্‌—না—না—কক্ষনো না।

শান্তি কিছুদিন থেকে দীপক ও স্বাতীর হালচাল লক্ষ্য কর্‌ছিল। তাদের দুজনকার তখন মনের যে অবস্থা তাকে প্রেম বলা যায় না, তবে তার পরিণতি প্রেম বটে। মানুষের মনের এই অবস্থাটাকে ঠিক বীজ বপনের আগে জমির অবস্থার সঙ্গে তুলনা করা চলে। এ জমি পুরুষে চিনতে পারে না। চিনতে পারে সেই নারী যে কোনো না কোনো রকমে সেই পুরুষের অনুরাগিণী। নারীজাতির একান্ত নিজস্ব ও জন্মগত সেই শক্তির বলে শান্তি বুঝতে পারছিল যে, দীপক স্বাতীর অনুরাগী হয়ে পড়্‌ছে। শান্তি মনে করেছিল যে, দীপককে স্বাতীর কথা জিজ্ঞাসা করলে সে তাকে বলে ফেল্‌বে। কিন্তু সে অস্বীকার করায় শান্তি বল্লে—তবে আমার আন্দাজ ভুল হয়েছে। কিন্তু স্বাতী তোমায় ভালবাসে।

শান্তির এই চালটীতেই দীপক মাৎ হোয়ে গেল। সে ব্যস্ত হোয়ে বল্লে—না না—যা—তোমার সব মিথ্যে কথা।

শান্তি তার অবস্থা দেখে বল্লে—কিচ্ছু মিথ্যে নয়।

দীপক বল্লে—কি কোরে জান্‌লে ?

শান্তি বল্লে—তুমি যদি সত্যি কথা বল তা হোলে বল্‌ব।

—কি সত্যি কথা ?

—এই স্বাতীকে তুমি ভালবাস কি না ?

দীপক এবার আম্‌তা-আম্‌তা কোরে বল্‌তে লাগ্‌ল—সত্যি বল্‌ছি বৌদি, স্বাতীকে আমার ভাল লাগে—এই পর্য্যন্ত !

শান্তি বল্লে—পথে এস। তা হোলে এতক্ষণ চালকী করা হচ্ছিল কেন ?

দীপক বল্লে—তুমি গুরুজন, তোমার কাছে ও-সব কথা বল্‌তে সাহস হচ্ছিল না।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় স্বাতীকে পড়াতে বসে দীপক তাকে যেন অন্য চক্ষে দেখ্‌লে। তার উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের সুষমা, তার নয়ন প্রান্তে চপল হাসি, তার প্রশ্ন জিজ্ঞাসার ভঙ্গিমা, পড়া বুঝিয়ে নেবার সময় মুখের দিকে চেয়ে থাকা, চোখে চোখ পড়্‌তেই বইয়ের দিকে চোখ নামিয়ে নেওয়া এ সবই দীপকের কাছে অর্থে ভরে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। যতক্ষণ সে স্বাতীর কাছে বসে রইল ততক্ষণ শান্তির সেই কথাগুলি দীপকের মনের মধ্যে দীপশিখার মতন জ্বল্‌তে লাগ্‌ল। কতবার সে তাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে উদ্যত হোয়ে তখুনি আবার নিজেকে সংযত কোরে ফেল্লে। যদি বৌদি তার সঙ্গে ঠাট্টা কোরে থাকে।

সেদিন বাড়ীতে ফিরে এসে শান্তিতে সে ঘুমুতে পারলে না। কতবার উঠে বাতি জ্বালিয়ে সে নানা রকমের বই পড়বার চেষ্টা

করলে কিন্তু কিছুতেই সে পড়ায় মনোনিবেশ করতে পারলে না। শেষকালে সে ক্লান্ত হোয়ে বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়ল।

শান্তি দীপককে সেদিন যে খোঁচাটা দিয়েছিল সেটা তার প্রেমের পথে কাঁটা না হোয়ে বরং আরও সহায় হোয়ে দাঁড়াল। স্বাতীর বয়স তখন ষোলো। ভালবাসার পাত্র নির্ব্বাচন করবার মতন বুদ্ধি তার পাকে-নি। দীপক তাকে ভালবাসে এ কথা জেনে সে নিজেকে গৌরান্বিতাই বোধ করলে। ক্রমে দীপকের পড়াবার সময়ও বেড়ে যেতে লাগল।

কিছুকাল এইভাবে কাটবার পর একদিন দীপক শান্তিকে বল্লে—বৌদি, এবার তোমায় একটি কাজ করতে হবে যে!

শান্তি জিজ্ঞাসা করলে—কি কাজটা শুনি?

দীপক একটু ঢোক গিলে বল্লে—কাজটা বিশেষ সোজা নয়—শক্ত কাজ।

শান্তি বল্লে—শুনিই না কি শক্ত কাজ? সত্য মাসীকে বলতে হবে যে, আসচে ফাগুনেই—

দীপক বল্লে—আরে না না—তাঁকে আমিই বল্‌ব'খন।

—তবে?

—বাবাকে বলে তাঁর কাছ থেকে অনুমতি আদায় করতে হবে।

শান্তি প্রস্তাবটা খুব আহ্লাদের সঙ্গে গ্রহণ না করলেও দীপকের আগ্রহ ও ইচ্ছায় স্বীকৃত হোলো। পরের দিন সমস্ত দিন ধরে বিশ্বমোহনের কাছে কথাটা কেমন কোরে পাড়তে

হবে দীপক শান্তিকে তা শেখাতে লাগ্‌ল। প্রস্তাবটা শুনে বিশ্বমোহনের কি বলা সম্ভব। শান্তি তার কি উত্তর দেবে এই সব আলোচনায় দুপুরটা কেটে গেল। দীপক বল্লে যে, বিয়ে হোয়ে গেলে স্বাতীকে নিয়ে সে এই বাড়ীতেই থাকবে। উৎসাহের মুখে সে শান্তিকে বলে ফেল্লে—তোমাকেও কিন্তু আমাদের কাছে এসে থাকতে হবে বৌদি। তারপর এখানে স্কুল প্রতিষ্ঠা হোলে আমরা সবাই গিয়ে বড় বাড়ীতে থাকব।

দীপক শান্তিকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলে যে, সুকুমার-দা ফিরে এলেও তারা তাদের সঙ্গেই থাকবে, আলাদা বাড়ীতে যাবে না।

সন্ধ্যাবেলা বিশ্বমোহন বাড়ী ফেরবার পর দীপক শান্তিকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে স্বাতীদের বাড়ী চলে গেল।

সেদিন ছিল শুক্রবার। শনি ও রবিবার দু-দিন ছুটি বলে শুক্রবার রাত্রে স্বাতী আর পড়্‌ত না। দীপক গিয়ে সত্যবালার কাছে বস্‌ল।

কথায়-কথায় সত্যবালা জিজ্ঞাসা করলেন—কি রে দীপ আজকাল তোর বাবার মেজাজ কেমন?

দীপক বল্লে—কিছু বুঝতে পারি না মাসিমা। তবে শিগ্‌গীর যে আমাদের স্কুল হবে বলে তো মনে হয় না।

সত্যবালা বল্লেন—ইস্কুল করতে দিতে যখন তোর বাবার আপত্তি তখন অন্য কিছু একটা কর্ না।

দীপক বল্লে—করবার তো অনেক কাজই রয়েছে কিন্তু যাই করতে যাব তাতে টাকার দরকার। এই দেখুন না, এ পাড়ায় ছোট-খাট একটা হাসপাতাল দরকার—কিন্তু টাকা কই? টাকা চাই—এ না হোলে কিছুই হবার উপায় নেই—অথচ সেই টাকাই আমার নেই।

কিছুক্ষণ চুপ কোরে থেকে সে বল্লে—আমি কিন্তু নিরাশ হই-নি মাসীমা। ইচ্ছা থাকলে টাকা এসে জুটবেই।

হাসপাতাল, স্কুল ও নানারকম শিক্ষা ও সেবার প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে সেদিন সে অনেক কথাই বল্লে। কিন্তু তার মন পড়েছিল বাড়ীর দিকে। গল্প করতে-করতে সে ইচ্ছা কোরে অন্য দিনের চেয়ে দেরী কোরেই উঠ্‌ল। যাবার সময় স্বাতীকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বল্লে—স্বাতী, আজ রাতে আমাদের বিয়ের কথা বাবাকে বলা হবে। কাল আমি তোমার বাবাকে বল্‌ব। আমার বিশ্বাস যে ব্রাহ্মমতে বিয়ে দিতে তিনি আপত্তি করবেন না।

স্বাতী কোনো কথা বল্লে না। লজ্জা ও আনন্দে তার কিশোরী-হৃদয় ভেঙে পড়তে লাগ্‌ল। সে দীপকের দিক্ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে। দীপক আবার বল্লে—আমরা যে-সব কাজের জন্য প্রস্তুত হচ্ছি তুমি তাতে আমাদের সহায় হবে তো স্বাতী?

ষোলো বছরের মেয়ে স্বাতী বল্লে—তুমি আমায় যা করতে বলবে আমি তাই করব।

এর চাইতে ভাল কোরে বলবার ভাষা সে খুঁজে পেলে না।

স্বাতীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দীপক বাড়ীর দিকে চল্‌ল। তার মনে হচ্ছিল শান্তি এতক্ষণ শুভ সংবাদ নিয়ে তার অপেক্ষায় বসে আছে। হয়ত দেরীর জন্য তার কাছে বকুনি খেতে হবে।

দীপক বাড়ীতে গিয়ে দেখলে যে, তার জন্য কেউ অপেক্ষা কোরে বসে নেই। অন্য দিনেরই মত তার অপেক্ষায় শূন্য বাড়ী হা-হা করছে। তার মনে হোলো শান্তি হয়ত তার জন্য বসে থেকে-থেকে চলে গিয়েছে, কিন্তু চাকরকে জিজ্ঞাসা কোরে জানলে যে কেউ আসে-নি। খাওয়া শেষ কোরে বাড়ীর দিকের জানলা খুলে দিয়ে সে দেখলে যে, শান্তির ঘরে তখনো আলো জ্বল্‌ছে। দীপক তখুনি নেমে বাগানে গিয়ে শান্তির জানালার নীচে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় ডাক্‌লে—বৌদি।

শান্তি তার ডাক শুন্‌তে পেলে না। দীপক ছোট্ট একটা ইট তুলে জানলা লক্ষ্য কোরে ছুঁড়্‌লে। কিন্তু ইট ঘরের মধ্যে না গিয়ে দেওয়ালে ঠেকে তারই গায়ের ওপর এসে পড়্‌ল। দীপক বিরক্ত হোয়ে নিজের ঘরে ফিরে এল।

পরদিন খুব ভোরে শান্তি দীপককে ঘুম্ থেকে তুলে বল্লে—ঠাকুর-পো, সর্ব্বনাশ হোয়ে গিয়েছে ভাই।

দীপকের বুকটা ছাঁৎ কোরে উঠ্‌ল। কি যে হোয়েছে সে কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে তার সাহস হোলো না। সে চুপ কোরে বিছানার ওপর বসে রইল।

শান্তি বল্লে—আমি প্রস্তাব করা-মাত্র মামা একেবারে

তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠ্‌লেন। তিনি বল্লেন যে, তোমাকে অন্য কোথায় পাঠিয়ে দেবেন।

এবার দীপক জিজ্ঞাসা করলে—কি বল্লেন?

শান্তি বল্লে—কি যে বল্লেন মাথামুণ্ডু আমার কি সব মনে আছে। জানোই তো রাগ্‌লে উনি কি রকম হোয়ে যান। তোমাকে কতকগুলো গালাগাল দিলেন।

এই অবধি বলে শান্তি চুপ করলে। দীপকও তাকে আর কোনো প্রশ্ন করলে না। সে খোলা জানালাটার দিকে চেয়ে চুপ কোরে বসে রইল।

জানালা দিয়ে সকালবেলার রোদ্দুর ক্রমে ঘরের মধ্যে গড়িয়ে আসতে লাগল। দীপক ও শান্তি কারো মুখে কোনো কথা নেই। অনেকক্ষণ এইভাবে কেটে যাবার পর শান্তি বল্লে—আমাকে ক্ষমা কর ঠাকুর-পো, আমার জন্যই তোমাকে এই লাঞ্ছনা সইতে হোলো।

দীপক শান্তির মুখের দিকে চেয়ে দেখ্‌লে যে, সহানুভূতিতে সে মুখখানা করুণ হোয়ে উঠেছে। সে বল্লে—না না তোমার তো কোনো দোষ নেই—

এমন সময় বেহারা এসে বল্লে—দীপক বাবাকে সাহেব সেলাম দিয়েছেন।

দীপককে যে কেন ডাকা হয়েছে তা বুঝতে তার এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব হোলো না। সে তখুনি বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তাকে যেতে দেখে-শান্তি বল্লে—আমি যাব তোমার সঙ্গে?

শান্তি সঙ্গে থাকলে বিশ্বমোহনের রাগের মাত্রা যে অনেক-খানি কম হবে তা জেনেও সে বল্লে—না তোমাকে আর কেন জড়াব, তুমি থাক।

বিশ্বমোহন ড্রইং-রুমে দীপকের অপেক্ষায় বসেছিলেন। সে গিয়ে তাঁর সাম্‌নে দাঁড়াতেই তিনি জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—তোমার বয়স কত?

প্রশ্ন শুনে দীপক দস্তুরমতন ভড়্‌কে গেল। পিতা যে কেন তাকে ডেকেছেন তা সে জান্‌ত এবং সে সম্বন্ধে তাকে যা বলা হবে তারও কিছু-কিছু যে সে আন্দাজ করতে পারে-নি তা নয়। কিন্তু প্রথমেই এই প্রশ্ন করায় কোন দিক্‌ থেকে যে তাকে আক্র-মণ করা হবে তা সে বুঝতে পার্‌লে না। বিশ্বমোহন আবার জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার বয়স কত?

পিতার প্রশ্নের উত্তরে সে বল্লে—বাইশ।

বিশ্বমোহন তাঁর গলা এক পর্দ্দা চড়িয়ে বলেন—বাইশ নয়—একুশ।

দীপক চুপ কোরে দাঁড়িয়ে রইল। বিশ্বমোহনও কিছুক্ষণ চুপ কোরে থেকে বল্লেন—এই একুশ বছর বয়সের মধ্যেই তুমি এমন একটি পাপ করলে যার জন্য তোমাকে তিন বছর হাজত খাটতে হোলো। নেহাৎ অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন ছিল বলে ফাঁসী বা দ্বীপান্তর ভোগ থেকে এড়িয়ে গিয়েছ। কিন্তু তা হোলেও আমি মনে করেছিলুম যে, তোমার মনুষ্যত্বের কিছু অবশিষ্ট আছে। কিন্তু তাও তুমি হারিয়েছ! শেষকালে

তুমি ভদ্রলোকের বাড়ীর সর্ব্বনাশ কোরে বেড়াতে আরম্ভ করেছ ?

দীপক কি একটা কথা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু বিশ্বমোহন তাকে থামিয়ে দিয়ে বল্লেন—স্বাতী দুধের মেয়ে তার মাথাটা খাচ্ছ কেন ?

এবার দীপক বল্লে—স্বাতীকে আমি ভালবাসি—

বিশ্বমোহন গলার সুর আরও এক পর্দ্দা চড়িয়ে বল্লেন—চুপ করো। তোমার এখন ভালবাসাবাসি বা বিয়ের কথা ভাববার বয়স নয়। এ লেখাপড়া শেখবার বয়স।

এই অবধি বলে বিশ্বমোহন চুপ করলেন। দীপক কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দরজার দিকে অগ্রসর হোলো। বিশ্বমোহন তাকে আবার ডেকে বল্লেন—আর শোনো, আমি হাজারীবাগ সেন্ট কলোম্বাস কলেজের প্রিন্সিপ্যালকে লিখেছি, তোমায় বোধ হয় তারা নেবে। পড়া-শুনা আরম্ভ কোরে দাও।

দীপক বল্লে—আমি আর পড়্ব না।

বিশ্বমোহনের রাগের মাত্রাটা একটু কমে এসেছিল কিন্তু দীপকের উত্তর শুনে তিনি জ্বলে উঠে জিজ্ঞাসা করলেন—পড়্বে না! পড়্বে না তো কি কর্বে? আমার বাড়ীতে থাক্তে হোলে আমার কথামত চল্তে হবে। তা যদি না পার তো যেখানে খুশী চলে যাও—অমন ছেলের সঙ্গে আমি কোনো সম্পর্ক রাখ্তে চাই না।

দীপক বল্লে—পড়া শুনা আমার আর—

অত্যন্ত অসহিষ্ণুর মত হাত নেড়ে বিশ্বমোহন বলে উঠ্‌লেন—যাও যাও, কোনো কথা আমি শুনতে চাই না। আমি সাতদিন তোমায় সময় দিচ্ছি এর মধ্যে যা স্থির কোরে আমায় জানিও, যাও—

দীপক আর কোনো কথা না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দীপক তার ঘরে এসে দেখলে শান্তি তখনো বসে আছে। সে আস্‌বামাত্র শান্তি জিজ্ঞাসা করলে—কি হোলো ?

সে একটু হেসে বল্লে—বিশেষ কিছুই নয়।

কথাটা শান্তি বিশ্বাস করতে পারলে না। সে অবাক হোয়ে দীপকের মুখের দিকে চেয়ে রইল। দীপক একখানা চেয়ার টেনে তাতে বস্‌তে-বস্‌তে বল্লে—বৌদি, তোমাদের বাড়ীতে আমার আর থাকা চল্‌ল না ভাই। আমি চল্লুম।

শান্তি আবার জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কি হোলো কি শুনি না ?

দীপক বল্লে—বাবা আমায় বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন।

শান্তি আশ্চর্য্য হোয়ে বল্লে—তাড়িয়ে দিয়েছেন ! আচ্ছা তুমি বোসো তো, একবার আমি মামাবাবুর কাছ থেকে ঘুরে আসি।

শান্তি উঠে দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, দীপক তার হাত ধরে টেনে নিয়ে এসে খাটের ওপর বসিয়ে বল্লে—না, এ সম্বন্ধে আর কোনো কথা বাবাকে জিজ্ঞাসা কোরো না। আমি তাঁকে অনেক জ্বালিয়েছি আর জ্বালাতে চাই না।

শান্তি চুপ কোরে বসে রইল। দীপক আবার বল্লে—বৌদি আমায় কিছু টাকা দিতে পার ?

শান্তি বল্লে—হ্যা, কত টাকা।

দীপক বল্লে—হাজার পাঁচেক।

দীপকের কথা শুনে শান্তি প্রথমটা অবাক হোয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল। তারপরে বল্লে—অত টাকা তো আমার কাছে নেই। আমার কাছে শ'দেড়েক টাকা আছে।

দীপক আপনার মনে বল্লে—টাকাটা পেলে ভাল হোতো।

শান্তি বল্লে—আমার গয়নাগুলো বেচ্‌লে হবে না হাজার পাঁচেক টাকা। কি হবে অত গয়নায়—

দীপক বল্লে—হ্যাঁ তোমার যা গয়না আছে তা বেচ্‌লে পাঁচ হাজারের বেশী হবে। কিন্তু তা বেচে আমি টাকা চাই না। তোমার কাছে টাকা চেয়েছি একথা কারুকে বোলো না বৌদি।

শান্তি বল্লে—না তা বল্‌ব না, কিন্তু টাকা দিয়ে কি করা হবে শুনি ?

দীপক বল্লে—সে বল্‌ব'খন পরে—এখন না।

* * * *

দীপক সেদিন থেকে আর স্বাতীকে পড়াতে গেল না। বিশ্বমোহনের কথাগুলো সে ভুল্‌তে পারলে না। কলেজে পড়া তার দ্বারা আর হবে না। তার সেই উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল প্রাণ কিছুতেই আর কলেজের খাঁচায় ধরা দিতে চাইলে না। সে দিনকয়েক পাগলের মতন এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়িয়ে

একদিন সুমনাকে গিয়ে বল্লে—মা আমি তোমার কাছে কখনো কিছু চাইনি, আমাকে কিছু ভিক্ষা দেবে ?

সুমনা জিজ্ঞাসা করলেন—কি জিনিষ বাবা ?

—আমায় হাজার পাঁচেক টাকা দেবে ?

সুমনা অবাক হোয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—এত টাকা নিয়ে কি করবি ?

—আমি ব্যবসা করব।

সুমনা বল্লেন—উনি যে বল্‌ছিলেন তোকে আবার কলেজে ভর্ত্তি করিয়ে দেবেন।

দীপক বল্লে—আমি আর পড়্‌ব না মা। এতদিন পড়াশুনো ছেড়ে আর পড়ায় মন বসাতে পারব না। এই টাকাটা আমায় দাও, একটা ব্যবসার সুবিধা পেয়েছি এইতেই লেগে পড়ি।

সুমনা দীপকের কথা শুনে চুপ কোরে ভাবতে লাগ্‌লেন।

দীপক আবার বল্লে—কলেজে গিয়ে আবার কোনো দলে-টলে ঢুকে পড়্‌ব—

সুমনা বলে উঠ্‌লেন—না না বাবা তোমায় আর কলেজে যেতে হবে না। আমি টাকা দেব কিন্তু কারুকে বল্‌তে পারবে না যে আমি টাকা দিয়েছি। উনি শুন্‌লে—

দীপক তাঁর মুখের কথাটা কেড়ে নিয়ে বলে ফেল্লে—তা কি আর আমি জানি না মা! তুমি টাকাটা দাও কেউ জানতে পারবে না।

দীপকের কথা শুনে সুমনার অনেক কথাই মনে পড়্‌তে

লাগ্‌ল। মনে পড়্‌ল, এই ছেলে তাঁকে ছেড়ে একদণ্ড থাক্‌তে পারত না। রাত্রে গায়ে হাত বুলিয়ে গল্প না বল্লে তার ঘুম হোতো না। ঘুমের কথা মনে হোতেই সঙ্গে-সঙ্গে মনে পড়্‌ল একদিন রাত্রে তাঁর চোখে অশ্রু দেখে নিজের দেহের ব্যথা ভুলে সে তাঁকে বলেছিল, বাবা আমায় যখন মারবেন তুমি তখন ধরতে যেও না মা। সেই ছেলে আজ তাঁর কাছ থেকে কত দূরে সরে গিয়েছে। ছেলেবেলায় যে দিন দীপককে মাতৃস্নেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল সেদিন থেকে কতদিন চলে গিয়েছে। সুখে দুঃখে মা-ছাড়া হোয়ে তার দিন কেটেছে। সেই থেকে আজ পর্য্যন্ত মার কাছে সে কোনো আব্দারই করে-নি। আজ নিশ্চয় তার বড় প্রয়োজন—

সুমনা বলে ফেল্লেন—তুই ব্যবসা কর বাবা, আমি টাকা দেব। আমি থাক্‌তে তোর টাকার ভাবনা কি?

দীপক বল্লে—টাকাটা যে আজই চাই মা।

—আজই!

—হ্যাঁ টাকা পেলেই আমায় উড়িষ্যায় চলে যেতে হবে। সেখানে একটা হরতুকীর জঙ্গল নিচ্ছি, বিলেতে হরতুকী চালান দিতে হবে। অন্য লোকেরও আবার জঙ্গলটার ওপর নজর আছে কি না।

সুমনা দেরাজ খুলে তাঁর নিজের চেক বইখানা বের কোরে তখুনি পাঁচ হাজার টাকার একখানা চেক সই কোরে দীপকের হাতে দিলেন।

দীপক চেক পেয়ে তখুনি ব্যাঙ্কে ছুটল। সেখানে চেক ভাঙিয়ে সমস্ত দিন কতকগুলো বইয়ের দোকানে ঘুরে তাদের কাছে তারই লেখা খানকয়েক বই বিক্রির ব্যবস্থা কোরে সন্ধ্যের সময় বাড়ী ফিরে এল। শান্তি এতক্ষণ দীপকের ঘরেই তার অপেক্ষায় বসেছিল, সে আস্‌বা-মাত্র শান্তি জিজ্ঞাসা করলে—কি ঠাকুর-পো টাকা পেলে?

দীপক হাঁপাতে-হাঁপাতে বল্লে—পেয়েছি বৌদি, আমায় একটু চা কোরে খাওয়াতে পার?

দীপকের ঘরেই চায়ের সমস্ত সরঞ্জাম ছিল। শান্তি ষ্টোভ জ্বেলে জল চড়িয়ে দিলে।

চা খেয়েই দীপক আবার বেরুবার উদ্যোগ কর্‌ছে দেখে শান্তি বল্লে—আবার কোথায় যাচ্ছ? সমস্ত দিন তো এই ঘুরে এলে।

দীপক বল্লে—আজ থেকে আমার এই ঘোরা সুরু হোলো বৌদি, কবে যে থাম্‌ব তা জানি না।

শান্তি মনে কর্‌লে যে, দীপক তার সঙ্গে একটা নতুন রকমের রসিকতা কর্‌লে। সে খানিকক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে ধমকের সুরে বল্লে—এখন আর বেরুতে হবে না, বোসো।

দীপক বসে বল্লে—একবার স্বাতীর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। তুমি যদি বারণ কর তা হোলে আর যাব না বৌদি।

শান্তি বলে উঠ্‌ল—ওরে বাবা! না না এখুনি যাও। এখন তোমায় যেতে বারণ কোরে শেষে সারাজীবন ধরে ছোট জায়ের কাছে খোঁটা খেয়ে মরি আর কি।

দীপক শান্তির কথা শুনে একটু হাসবার চেষ্টা করলে। তারপর চেয়ার থেকে উঠে আস্তে-আস্তে বেরিয়ে গেল।

দীপক যে কেন আস্‌চে না স্বাতী তার কোনো কারণই অনুমান করতে পারছিল না। স্কুল থেকে ফেরবার পর কোনো কাজ না থাকলে প্রায়ই সে দীপকদের বাড়ীতে যেত কিন্তু এই ক'দিন সঙ্কোচ ও লজ্জায় সে বাড়ী থেকে বেরুতেই পারে-নি। ক'দিন উপরি-উপরি দীপককে দেখতে না পেয়ে সত্যবালা স্বাতীকে বলেছিলেন—দীপক কেন আস্‌চে না, বোধ হয় অসুক-বিসুক করেছে—একবার খোঁজ নিস্।

স্বাতী ঠিক করেছিল যে সেদিন যদি দীপক না আসে তবে সে নিশ্চয় তার খোঁজ নিতে যাবে। কিন্তু সেদিনও স্কুল থেকে ফিরে যাই-যাই কোরেও কিছুতেই সে সেখানে যেতে পারলে না।

এই ক'দিন স্বাতীর পড়াশুনা কিচ্ছু হয় নি। প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট সময়ে দীপকের এই গরহাজরী তাকে ভারী মনঃপীড়া দিচ্ছিল।

সেদিন সন্ধ্যা হবার পর স্বাতী অভ্যাসমত একখানা পড়বার বই খুলে বসে ভাবতে লাগল—কেন সে আস্‌চে না। বাড়ীর সবাই নিশ্চয় জানতে পেরেছে! ছি ছি কি লজ্জা—

এমন সময় তার চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়ে দীপক ঘরের মধ্যে ঢুকল।

দীপক স্বাতীর পাশে তার নির্দ্দিষ্ট চেয়ারখানিতে বসে তাকে জিজ্ঞাসা করলে—মাসীমা কেমন আছেন ?

স্বাতী বল্লে—সেই রকমই আছেন। ক'দিন তুমি আস-নি বলে বড় ব্যস্ত হয়েছেন।

স্বাতীর কথার দীপক কোনো উত্তর দিলে না। সে চুপ কোরে কি ভাবতে লাগ্‌ল।

স্বাতী জিজ্ঞাসা করলে—এ ক'দিন আসনি যে ?

দীপক তার কথা শুনে চম্‌কে উঠে বল্লে—হ্যাঁ আসি-নি। আমার আর বোধ হয় আর আসা হবে না স্বাতী!

স্বাতী দীপকের কথার মর্ম্ম ঠিক বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসু-নয়নে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল। দীপক বল্লে—তোমাকে তা হোলে সব কথা খুলে বলি স্বাতী। বাবা আমাদের দুজনের মিলনের বিরোধী। তিনি আবার আমাকে কলেজে ভর্ত্তি করাতে চান কিন্তু কলেজে পড়া আমার দ্বারা আর হবে না। বাবা বলে দিয়েছেন কলেজে না পড়লে তাঁর বাড়ীতে থাকা চল্‌বে না। তাই আমি চলে যাচ্ছি। যাবার আগে তোমার কাছে আমি বিদায় নিতে এসেছি। আর যাবার সময় তোমায় একটা অনুরোধ করছি—তুমি আমায় ভুলে যাও স্বাতী।

এই বলে দীপক মাথা নীচু কোরে বসে রইল। সে কিছুক্ষণ স্বাতীর মুখের দিকে চাইতে পারলে না।

স্বাতী জিজ্ঞাসা করলে—কোথায় যাবে ?

এবার দীপক স্বাতীর দিকে চেয়ে দেখ্‌লে, তার চোখ

ছুটো জলে ভরে উঠেছে। দীপক বল্লে—কোথায় যাব তা জানি না। তবে আমাকে যেতেই হবে।

স্বাতী আর কোনো প্রশ্ন করলে না। নিঃশব্দে তার দুই কপোল বয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়তে লাগ্‌ল। দীপক বল্লে—আমি চলে গেলে আমার কথা তোমার মনে থাকবে স্বাতী? আমায় ভুল্‌বে না?

কথাগুলো বলেই সে আবার বলে উঠ্‌ল—না না তোমায় অনুরোধ করছি স্বাতী, আমায় ভুলে যেও।

স্বাতী এবারও কোনো উত্তর দিলে না। সে প্রশ্নভরা দুটি সজল চক্ষু তুলে দীপকের দিকে চেয়ে রইল।

দীপক বল্লে—আমি যাই, যাবার আগে যদি সুবিধা হয় তা হোলে একবার মাসীমার সঙ্গে দেখা কোরে যাব।

স্বাতী কোনো উত্তর দিলে না।

দীপক চলে যেতেই সে দু-হাতের মধ্যে মুখ লুকিয়ে উচ্ছ্বসিত আবেগে কাঁদতে লাগ্‌ল।

পরদিন সকাল থেকে দীপককে আর দেখতে পাওয়া গেল না। শান্তি রোজ সকালেই দীপকের ঘরে এসে জুটত। সেদিন এসে তাকে দেখতে না পেয়ে বেড়াতে গেছে মনে কোরে ফিরে এল।

সমস্ত দিন দীপকের দেখা না পেয়ে শান্তি চঞ্চল হোয়ে উঠ্‌ল। তার পরের দিনও যখন তাকে ঘরে পাওয়া গেল না তখন সে দীপকের চাঁকরকে ডেকে জিজ্ঞাসা কোরে জান্‌তে পারলে যে, আজ দু-দিন তাকে দেখ্‌তেই পাওয়া যাচ্ছে না।

শান্তি মনে কর্‌লে হয়ত দু-চার দিনের জন্য সে কোথাও গিয়েছে। ফিরে এলে তাকে না বলে যাওয়ার জন্য দীপককে কি কি বলা হবে মনে-মনে সে তারই মহলা দিতে লাগ্‌ল।

বিশ্বমোহন দীপককে সাতদিন সময় দিয়েছিলেন। ঠিক সাতদিন কেটে যাবার পর তিনি দীপককে ডেকে পাঠালেন।

চাকর বল্লে—দীপক বাবা নেই।

বিশ্বমোহন বল্লেন—এলেই আমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে বল্‌বি।

চাকর বল্লে—আজ চারদিন আগে দীপক বাবা বেরিয়ে গিয়েছে, আজও ফেরে-নি।

কথাটা শুনে বিশ্বমোহন চম্‌কে উঠ্‌লেন। তিনি তখুনি গিয়ে সুমনাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—দীপক আজ চারদিন বাড়ীতে নেই, কোথায় গিয়েছে জান?

সুমনার বুকের ভেতরটা ধ্বক্ কোরে উঠ্‌ল। তিনি বল্লেন—কোথায় গিয়েছে তা তো জানিনা। কয়েকদিন আগে আমায় বল্‌ছিল বটে উড়িষ্যা না কোথায় যাবে।

অত্যন্ত অসহিষ্ণুভাবে বিশ্বমোহন বলে উঠ্‌লেন—উড়িষ্যা নয়, হাজারীবাগ। সেখানকার প্রিন্সিপ্যাল আমায় লিখেছেন তাকে পাঠিয়ে দিতে আর এ সময় সে গেল কোথায়?

সুমনা আর কিছু বল্লেন না। বিশ্বমোহন শান্তিকে ডাকলেন। তিনি জানতেন যে, দীপক সম্বন্ধে শান্তি ঠিক খোঁজ দিতে পার্‌বে। শান্তি এলে তিনি জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—মা জননী, দীপক আজ চারদিন বাড়ীতে নেই। তোমায় কিছু বলে গিয়েছে?

শান্তি বল্লে—না।

বিশ্বমোহন একটু চিন্তা কোরে আবার জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—সে যে বাড়ীতে নেই তা তুমি জান্‌তে?

শান্তি বল্লে—জানতুম। কিন্তু আমি মনে করেছিলুম যে শীগগীরই সে ফিরবে, সেইজন্য আর কারুকে জানাই-নি।

শান্তির কথা শুনে বিশ্বমোহন মোটেই সন্তুষ্ট হোতে পারলেন না। তিনি বল্লেন—না বলে ভাল কাজ কর-নি।

* * * *

দীপক হঠাৎ এই রকম বাড়ী ছেড়ে চলে যাওয়ায় মহা গোলমাল পড়ে গেল। বিশ্বমোহন দিনরাত তাকে গালাগালি দিতে লাগ্‌লেন। তার নির্জ্জন ঘরে গিয়ে শান্তি তার অভিমান-অশ্রু ঝরিয়ে দিয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল। আর সুমনা, কাঁদতেও পারেন না চুপ কোরে থাক্‌তেও পারেন না এই অবস্থায় দিন কাটাতে লাগ্‌লেন। স্বাতী অত পড়াশুনো কোরেও সে বছর ক্লাস প্রোমোশন পেলে না।

শান্তি প্রতিদিন সকালবেলা অভ্যাসমত দীপকের ঘরে গিয়ে তার বিছানা-পত্র ঝেড়ে তার টেবিলের ওপরকার ফুলদানী থেকে বাসি ফুলগুলো ফেলে দিয়ে তাতে টাট্‌কা ফুল এনে রাখ্‌ত। চাকরকে দিয়ে ঘর-দোর পরিস্কার করাত। দুপুর বেলা দীপকের অত্যন্ত প্রিয় বইগুলি তাক থেকে নামিয়ে ধুলো ঝেড়ে তুলে রাখ্‌ত। সকলে দীপক সম্বন্ধে যাই কিছু ধারণা করুক না কেন তার মনে হোতো যে, সে শীগ্‌গীরই ফিরে আসবে। দীপক যাবার সময় তাকে বলে না যাওয়ায়

তার মনের মধ্যে প্রতিদিনই যে অভিমান সঞ্চিত হোয়ে উঠ্‌ছিল কোনো দিক দিয়েই তাকে মুক্তি দিতে না পারায় সে অস্থির হোয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল।

এইভাবে প্রায় বছরখানেক কেটে যাবার পর একদিন শান্তি স্বাতীদের বাড়ীতে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলে—ঠাকুর-পো যাবার সময় তোমায় কিছু বলেছিল ?

যাবার আগে দীপক স্বাতীকে যা বলেছিল সে শান্তিকে তা খুলে বল্লে। স্বাতীর মুখে সমস্ত কথা শুনে দীপকের প্রতি তার অভিমান যে শুধু বেড়ে গেল না নয় তাকে না বলে যাওয়ায় স্বাতীর প্রতিও দুর্জ্জয় আক্রোশে তার মন বিষিয়ে উঠ্‌ল। নারী হৃদয়ের অতি দুর্জ্ঞেয় স্থানে এই আক্রোশের বাসা। সে স্বাতীর কাছে থেকে ফিরে এসে সুমনাকে দীপক ও স্বাতীর প্রেম-ঘটিত সমস্ত কাহিনী খুলে বল্লে। দীপক যে তাদের কারুকে না বলে যাবার সময় স্বাতীর কাছে থেকে বিদায় নিয়ে গিয়েছে এ কথাটাও বল্‌তে সে ভুল্লে না। সুমনা বিশ্বমোহনের কাছে স্বাতী ও দীপক সম্বন্ধে এই রকম একটা কথা শুনেছিলেন। কিন্তু ব্যাপারটা বিশ্বমোহন তাঁর নিজের মনোভাব ও ভাষা দিয়ে এমন কোরে তাঁর কাছে প্রকাশ করেছিলেন যে তিনি সেটাকে তেমন কিছুই মনে করতে পারেন-নি। দীপকের অদৃশ্য হওয়ার সঙ্গে তাঁর যে ঘনিষ্ঠ যোগটুকু ছিল তারই গোপনত্ব বজায় রাখবার জন্য এতদিন তিনি চেষ্টা কোরে এসেছেন। শান্তির মুখে তাদের সেই প্রেমকাহিনী শুনে

স্বাতীর প্রতি তিনিও প্রসন্ন হলেন না এবং বাড়ীতে কেউ এসে দীপক সম্বন্ধে কথা উত্থাপন করলেই দীপক নিরুদ্দিষ্ট হবার সমস্ত দোষটুকু কিশোরী স্বাতীর ওপরে চাপিয়ে দিতে লাগ্‌লেন।

স্বাতীর মা সত্যবালা বিছানায় শুয়ে-শুয়ে সেই কথাগুলো শুনতে পেলেন। তাঁদের কুমারী মেয়ের নামে ঘোঁট্‌টা বেশ পাকা রকমের হোয়ে ওঠবার আগেই একটি ভাল পাত্র দেখে তার সঙ্গে স্বাতীর বিয়ে দিয়ে দিলেন। এ বিষয়ে স্বাতীর নিজের কোনো মতামত থাকতে পারে কিনা সে কথা তাঁদের চিন্তাতেই যোগাল না।

প্রায় দু-বছর পরে সুমনা দীপকের একখানা চিঠি পেলেন। সে লণ্ডন থেকে তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে চিঠি লিখেছিল। এতদিন পরে ছেলের চিঠি পেয়ে তিনি কাঁদতে-কাঁদতে স্বামীর কাছে সমস্ত কথা খুলে বল্লেন। বিশ্বমোহন এবার আর স্ত্রীকে কিছু বল্লেন না। শুধু বল্লেন—হতভাগা মিথ্যেকথা বলাটাও বেশ একটা আর্টে দাঁড় করিয়েছে।

বিশ্বমোহন লণ্ডনে সুকুমার ও তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের লিখলেন তারা যেন দীপককে ধরে কলেজে ভর্ত্তি করিয়ে কিংবা ভারতবর্ষে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু কয়েক মাস বাদে সেখান থেকে উত্তর এল যে, দীপককে ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে বটে কিন্তু পাওয়া যায়-নি।

* * * *

দীপক কিছুকাল লণ্ডনে থেকে প্যারি শহরে চলে এল। লণ্ডনে তার জনকয়েক ফরাসী অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, তাদের সঙ্গে সে প্যারীর এক পল্লীতে এসে বাস করতে লাগ্‌ল। সে যে বাড়ীটায় বাস কর্‌ত সেখানকার অধিকাংশ অধিবাসীই-কেউ কবি, কেউ ঔপন্যাসিক কেউ অভিনেতা বা অভিনেত্রী, কেউ বা চিত্রকর। কোথায় তাদের জন্ম, কে তাদের আত্মীয়-স্বজন তার খোঁজ তারা রাখে না। গরীব তারা, অতি গরীব। দৈনিক নির্দ্দিষ্ট আহার তাদের জোটে না। কেউ বা একদিন একখানা বই বিক্রি কর্‌লে সকলে মিলে খুব হুল্লোড় কোরে খাওয়া-দাওয়া নেশা চল্‌ল। পরের দিন আবার যে কে সেই। সঞ্চয় বা সংশয়ের ধার তারা ধারে না। যেন উপভোগ করবার জন্যই তাদের জীবন অথচ তাদের বিরুদ্ধে সমস্ত পৃথিবী যড়যন্ত্র কোরে জীবন-যাত্রার সোজা পথগুলো আগ্‌লে বসে আছে। কিন্তু তাদের আনন্দের উৎস সমস্ত দৈন্য ও কষ্টকে ভাসিয়ে দিয়ে শতধা উৎসারিত হোয়ে পড়্‌ছে। এদের সঙ্গ দীপককে মাতিয়ে তুলে। সে মিঃ হোম্‌সের কাছে ফরাসী শিখেছিল। কিছুদিন সেখানে থেকে সে কাগজে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রবন্ধ ও পুরাণের গল্প ইত্যাদি প্রকাশ কোরে জীবিকা অর্জ্জন কর্‌তে লাগ্‌ল। এর দ্বারা তার জীবন সুখে না হোক এদেরই মত সুখে-দুঃখে কাটতে লাগ্‌ল।

দীপকের মনে হোতে লাগ্‌ল যে এতদিনে তার প্রাণ-বীজ

উর্ব্বর ভূমি পেয়েছে। সংসারের সমস্ত কাঠিন্য ভেদ কোরে তার জীবনের অঙ্কুর এইখানেই ফুটে উঠ্‌বে। সে মহানন্দে জীবনের সেই উদ্দাম স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলে। রূপের চর্চ্চা রূপ দর্শন ও রূপ সুধা পান কোরে সে অরূপের পূজায় মন প্রাণ ঢেলে দিলে। কোনোদিন খাওয়া জোটে, কোনোদিন জোটে না, কোনো দিন এমন জোটে যার তাল সাম্‌লাতে সাতদিন কেটে যায়। এরই মধ্যে কখনো হয়ত কোনো অসতর্ক মুহূর্ত্তে স্বাতীর অশ্রু-সজল মুখখানা তার অন্তরলোকে উঁকি দেয়, কখনো বা কোনো বিখ্যাত চিত্রকরের আঁকা মাতৃমূর্ত্তি দেখে তার মার কথা মনে পড়ে যায়। দিবাস্বপ্নে কখনো বা শান্তির কণ্ঠস্বর শুনে সে চম্‌কে ওঠে—কি ঠাকুর-পো আমাদের যে ভুলে গেলে? বেড়াতে-বেড়াতে রাস্তায় ছোট মেয়ে দেখে কখনো বা হঠাৎ তার মনের মধ্যে অর্দ্ধস্ফুট পদ্ম-কোরকের মত অনুর মুখখানা ভেসে ওঠে। কিন্তু তাদের চিন্তা সে মনের মধ্যে স্থায়ী হোতে দেয় না। জোর কোরে সে চিন্তা মন থেকে মুছে ফেলে দিয়ে সে বল্‌তে থাকে—নাই নাই নাই, আমার কেউ নাই, আমিও কারুর নই। আমার সঙ্গী ও সঙ্গিনীদের মতন এই বিপুল ধরায় আমি একা—স্বজনহীন, বন্ধনহীন। তাদের মত পথে-পথেই আমি মানুষ হয়েছি। পথই আমার বাড়ী, আশ্রয়দাতা, বন্ধু। এই পথ যেদিন আশ্রয়দানে বিমুখ হবে সেদিন এই সঙ্গীদের মতন হাঁসপাতাল কিংবা পাগলা গারদে জীবন-পাত্র

অবহেলায় উপুড় কোরে এখানকার সুখ-দুঃখের দেনা চুকিয়ে চলে যাব।

দীপক একদিন প্যারীর রূপ-মন্দিরের একটি নিভৃত কোনে একখানা বেঞ্চিতে পড়ে ঘুম দিচ্ছিল এমন সময় একটা ঝাঁকানি পেয়ে সে ধড়মড় কোরে উঠে দেখ্‌লে যে, তার সাম্‌নে একটি বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে রয়েছেন। বৃদ্ধ বল্লেন—যুবক এ মন্দিরে চোখ চেয়ে থাকতে হয়। এখানে যতক্ষণ চোখ বুঁজিয়ে থাক্‌বে ততক্ষণ ঠক্‌বে।

বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর শুনে দীপক চম্‌কে উঠ্‌ল। সে মুখ তুলে তাঁর দিকে চেয়ে দেখ্‌লে। কিন্তু শ্মশ্রুগুম্ফশোভিত সে মুখ কোথাও দেখেছে বলে সে মনে করতে পারলে না। দীপক ধীরে ধীরে বল্লে—মশায়, এখানে চোখ চেয়ে থাকার চাইতে চোখ বুঁজিয়ে দেখতে পাওয়া যায় অনেক বেশী।

বৃদ্ধ দীপকের কথা শুনে হো-হো কোরে হেসে তার পাশে বসে পড়্‌লেন। তারপরে খানিকক্ষণ তার দিকে চেয়ে থেকে বল্লেন—যুবক, দেখ দিকিন আমায় চিন্‌তে পার কি না।

দীপক আবার তার মুখের দিকে চেয়ে রইল। তারপরে ধীরে-ধীরে বল্লে—আপনাকে আমার খুবই পরিচিত বলে মনে হচ্ছে কিন্তু কিছুতেই চিন্‌তে পারছি না।

বৃদ্ধ একটু অভিযোগের সুরে বল্লেন—তা হোলে তোমার স্মরণশক্তিটা একেবারে নষ্ট—

বৃদ্ধের কথা শেষ করতে না দিয়ে দীপক লাফিয়ে উঠে

বল্লে—চিনেছি চিনেছি, আর বল্‌তে হবে না। আপনি মিঃ হোমস্‌! কেমন ঠিক কিনা?

দীপকের মনে পড়তে লাগ্‌ল ঠিক সেই মুখই তো বটে! চোখের সেই তীব্র চাহনি, সেই খাড়া নাক। তখন তিনি দাড়ি গোঁফ কামাতেন, এখন সাদা দাড়ি আর গোঁফে মুখমণ্ডল আবৃত। তার মনের মধ্যে শৈশবের ছবিগুলো একে-একে ফুটে উঠতে লাগ্‌ল। তার মনে পড়্‌ল, এই দূরদেশবাসী প্রায় দশ বৎসর ধরে পরমাত্মীয়ের মত তাকে শিক্ষা দিয়েছেন। কৃতজ্ঞতায় সে বৃদ্ধের দুটো হাত এক সঙ্গে চেপে ধরে বল্লে—আমার শৈশবের বন্ধু, আজ এই অবস্থায় যে আপনার সঙ্গে দেখা হবে এ আমার ধারণার অতীত ছিল। চিনতে পারি-নি বলে ক্ষমা করবেন।

মিঃ হোম্‌স বল্লেন—আমি এখানে কয়েকদিনের জন্য বেড়াতে এসে একটা হোটেলে উঠেছি। সেখানে আমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা আছেন। চল সেখানে, তারা তোমাকে দেখলে বড় খুসী হবে।

দীপক অনিচ্ছার সঙ্গে বল্লে—আমার কি সেখানে যাওয়া উচিত হবে? না থাক।

মিঃ হোম্‌স তার কোনো কথা না শুনে তাকে টেনে নিয়ে চল্লেন। পথে যেতে-যেতে জিজ্ঞাসা করলেন—কোথায় থাক?

দীপক বল্লে—ল্যাটিন কোয়ার্টারে।

মিঃ হোম্‌স্‌ হেসে বল্লেন—তোমার বাবার চিঠি মাঝে-মাঝে

পাই। তোমার সমস্ত কথাই তিনি আমাকে লিখে জানিয়ে ছিলেন। তুমি বাড়ী ফিরে যাবে?

দীপক অন্যমনস্কভাবে বল্লে—বাড়ী? না।

মিঃ হোম্‌স্ জিজ্ঞাসা করলেন—শান্তির স্বামী লণ্ডনে পড়া শুনো করত, তার খোঁজ রাখ?

অসহিষ্ণু আবেগে দীপক জিজ্ঞাসা করলে—না, তার কি হয়েছে?

—সে বিলেতে বিয়ে কোরে দিব্যি সংসার পেতে বসেছে। দেশে ফেরবার নাম করে না।

মিঃ হোম্‌সের কথাগুলো দীপক যেন বুঝতে পারলে না। সে অবাক হোয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইল। হোম্‌স্ বলে যেতে লাগলেন, আহা বেচারী শান্তি! তার চিন্তা এই বৃদ্ধ বয়সে আমাকে নিয়ত পীড়া দেয়। আমার জীবনের সব থেকে ভাল সময়টা আমি তোমাকে ও শান্তিকে শিক্ষা দিয়ে কাটিয়েছি কিন্তু তোমাদের দুজনের কেউ সুখী হোলে না। এ চিন্তা আমার দুঃসহ।

দীপক কোনো উত্তর দিলে না। তাদের গাড়ী গিয়ে হোটেলের দরজায় দাঁড়াল। মিঃ হোম্‌স্ দীপককে এক রকম টেনে নিয়ে গিয়ে তাঁর স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তাঁরা যে কয়দিন প্যারীতে থাকলেন দীপককেও তাঁদের সঙ্গে থাকতে হোলো। বিদায়ের দিনে দীপক মিঃ হোম্‌স্‌কে বল্লে—আমার সঙ্গে যে আপনার দেখা হয়েছিল এ কথা বাড়ীতে জানাবেন না।

দীপক আবার পুরোনো আড্ডায় ফিরে এল। আবার সেই উচ্ছৃঙ্খলতার আবর্ত্তে তার দিন কাটতে লাগ্‌ল। কিন্তু এবার আর এই স্রোতে সে যেন গা ভাসিয়ে দিতে পারছিল না। হঠাৎ কয়েকটা দিন হোম্‌স্‌-পরিবারের শান্ত নিরুদ্বেগ আবহাওয়ার মধ্যে কাটিয়ে সে যেন তার সেই পুরোনো দিনের গতি কিছুতেই ফিরিয়ে পাচ্ছিল না। ছুটতে-ছুটতে পথের মাঝে হঠাৎ এই যতিভঙ্গ হওয়ায় যে জীবনকে সে আদর্শ বলে মেনেছিল তার মধ্যে প্রতি পদেই আগেকার সেই অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব বোধ করতে লাগ্‌ল।

নিজের দেশ ও দেশের পতিত নর-নারীদের উন্নত কোরে তোলবার কল্পনা তার মনের মধ্যে লাফালাফি করত। নানা প্রতিকূল আবহাওয়ায় দেশে থেকে তা করবার তার সুযোগ হয়-নি। বিদেশে এসে তার মাঝে-মাঝে মনে হোতো এইখানে থেকেই সে নিজেকে তার আদর্শের উপযোগী কোরে তুল্‌বে। কিন্তু আকস্মিকভাবে মিঃ হোম্‌সের সঙ্গে দেখা হওয়া ও তাঁর বাড়ীতে কয়েকদিন থেকে তাঁর সঙ্গে এই সব কথা নিয়ে আলোচনা কোরে তার মনে বর্ত্তমান জীবনযাত্রার প্রতি সন্দেহ জাগতে লাগ্‌ল। কিন্তু তবুও সে তাদের একেবারে পরিত্যাগ করতে পারলে না। সে নিজের সঙ্গে তর্ক কোরে স্থির করলে, জগতের মধ্যে এমন স্থান কোথাও নেই যেখানে বাস করলে তার আদর্শ ফলবতী হবে। নানা প্রতিকূল ও অনুকূল অবস্থার ভেতর দিয়ে তাকে কার্য্যক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হোতে হবে। নানা

আবহাওয়ার মধ্যে থেকে যেখানে যতটুকু সম্ভব ততটুকু সংগ্রহ কোরে বাকীটুকু ফেলে দিতে হবে।

প্যারীতে এইভাবে দীপকের দিনগুলো কাটছিল এমন সময় একদিন সকাল বেলায় তার ছোট্ট ঘরটির দরজা নাড়ার শব্দে তার ঘুম ভেঙে গেল। দীপক বিছানায় শুয়ে-শুয়েই সাড়া দিলে—কে ?

বাইরে থেকে নারীকণ্ঠে উত্তর এল—আমি আনা।

দীপক বল্লে—ভেতরে এস।

আনা ঘরের মধ্যে এসেই বল্লে—এখনো বিছানায়! ব্যাপার কি ?

দীপক বল্লে—বিছানা ছেড়ে উঠ্‌তে পারছি না। মাথার মধ্যে কে যেন মুগুর পিটছে

আনা ধীরে-ধীরে বিছানার কাছে এসে দীপকের মাথায় হাত দিয়ে বল্লে—উঃ! এখনো গরম রয়েছে। তুমি শুয়ে থাক আমি তোমার মাথাটা ঠাণ্ডা জলে ধুয়ে দিচ্ছি।

দীপক শুয়ে-শুয়েই বল্‌তে লাগ্‌ল—আনা তুমি বড্ড ভাল, লক্ষ্মী মেয়ে—

আনা জল আনতে-আনতে বল্লে—ও রকম কোরে যদি খোসামোদ কর তা হোলে আমি চলে যাব।

দীপক বল্লে—আচ্ছা তুমি আজ সকালে হঠাৎ যে আমার ঘরে এসে উপস্থিত হোলে। আগে তো আমায় একদিন উঁকি দিয়েও দেখ-নি।

আনা বল্লে—কাল ওরা যখন আমার ঘরের সামনে দিয়ে তোমায় অজ্ঞান অবস্থায় নিয়ে যাচ্ছিল তখন আমি দেখেছিলুম কি না—

দীপক বল্লে—দু-দিন যা হুল্লোড় গিয়েছে!

একটু চুপ কোরে থেকে সে জিজ্ঞাসা করলে—আচ্ছা ওরা কি উঠেছে?

আনা দীপকের মাথায় জল দিতে-দিতে বল্লে—কেউ না। আজ আর কেউ উঠ্‌বেও না।

দীপক চোখ বুজিয়ে বল্‌তে লাগ্‌ল—আ! বড় আরাম হচ্ছে। ভাগ্যিস্ তুমি এসেছিলে, তা না হোলে কতক্ষণ যে এই যন্ত্রণা ভোগ করতে হোতো—

আনা বল্লে—তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। তোমাকে কত দিন বল্‌ব বলে মনে করেছি কিন্তু সঙ্কোচে তোমার ঘরে ঢুকতে পারি-নি।

—সঙ্কোচ!—দীপক বিছানায় উঠে বস্‌ল। সে বল্‌তে আরম্ভ করলে—সঙ্কোচের কথা কি বল্‌ছ আনা! সঙ্কোচ, সংস্কারের ধার কি আমরা ধারি? তুমি যেদিন থেকে এ বাড়ীতে এসে বাস করতে আরম্ভ করেছ সেদিনই আমরা ঠিক কোরে নিয়েছি যে তুমি আমাদেরই একজন।

অনেকগুলো কথা তাড়াতাড়ি বলে ফেলে দীপক যেন শ্রান্ত হোয়ে পড়্‌ল। সে মাথায় হাত দিয়ে আবার শুয়ে পড়্‌ল। কিছুক্ষণ চুপ কোরে পড়ে থেকে সে আস্তে-আস্তে বল্‌তে লাগ্‌ল—

এই দেখ না, তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় খুব নিবিড় নয়। কিন্তু আমি যদি সংস্কার কিংবা সঙ্কোচের ধার ধারতুম তা হোলে কি এমন খোলা-খুলিভাবে তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারতুম?

এবার আনা বল্লে—সত্যি কথা। কিন্তু কি জান দীপ, আমি যে আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ হয়েছি সেখানে এই জিনিষগুলিই ছিল সভ্যতার প্রধান অঙ্গ। এর প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করতে কিছুদিন সময় লাগ্‌বে। এই সময়টুকু আমাকে দিতে হবে।

দীপক বল্লে—আনা এখানে বসে আমাকে তোমার জীবনের কাহিনী শোনাও।

দীপকের শিয়রে বসে আনা তার জীবনের ইতিহাস বল্‌তে লাগ্‌ল। করুণ সে কাহিনী! তাদের বাড়ী রুশিয়ায়। সে বাপ-মায়ের একমাত্র মেয়ে। তার বাবা ছিলেন মধ্যবিত্ত জমিদার এবং রাজ সরকারের একজন পদস্থ কর্ম্মচারী। আনা মস্কোতে লেখাপড়া শিখে প্যারীতে এসেছিল সঙ্গীত শিখ্‌তে। ছেলেবেলা থেকে সঙ্গীতের প্রতি প্রবল অনুরাগ থাকায় তার বাবা তাকে প্যারিতে পাঠিয়েছিলেন। আজ প্রায় ছয় বছর সে প্যারীতে আছে। যুদ্ধের কিছু পরে সে সঙ্গীতের উপাধি পেয়ে বাড়ী ফেরবার চেষ্টা করছিল কিন্তু সেখানে থেকে তার বাপ মা তাকে আসতে বারণ করায় সে বাড়ী যেতে পারে-নি। নানা রকম উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে তার দিন কাটছিল এমন সময় সে শুনতে পেলে যে তাদের দেশে বিদ্রোহের আগুন

জ্বলে উঠেছে। তারই কিছুদিন পরে এক নিদারুণ সংবাদ তাকে এই বিশাল সংসার-সমুদ্রে একলা ফেলে দিয়ে চলে গেছে। বিদ্রোহের কিছুদিন পরেই সে সংবাদ পেলে যে, বিদ্রোহীরা তার বাবা মা ও পরিবারের সমস্ত লোককে হত্যা কোরে তাদের যথাসর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়েছে। সে আরও বল্লে যে, তার এক খুড়ী আছেন তাঁর সঙ্গে রাজ-পরিবারের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকায় বিদ্রোহীরা তাকে হত্যা করবার জন্ম ঘুরে বেড়াচ্ছে। তিনি তাদের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। এই খুড়ী নিঃসন্তান। তাকেই তিনি নিজের মেয়ের মতন পালন করেছেন। এই খুড়ী এখন কোথায় আছেন তাও সে জানে না। সেই থেকে আজ দু-বছর সে নানা জায়গায় সঙ্গীত শিক্ষা দিয়ে নিজের জীবিকা উপার্জ্জন করছে।

নিজের কাহিনী বলতে-বলতে আনার চক্ষু সজল হোয়ে উঠ্‌ল। দীপক শুয়ে-শুয়েই তাকে বল্লে—আনা তোমার জীবন কাহিনী খুব করুণ। তোমাকে কি বলে সান্ত্বনা দেব তা জানি না। তোমাদের দেশের কথা আমি শুনেছি। সেখানে আজ যে রক্তের স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে—কান পেতে শোনো তার কল্লোলে সুদিনের আগমনী শুনতে পাবে। কিন্তু আমরা! আমাদের কি আছে? আমাদের আশা করবারও যে কিছু নেই আনা!

আনা বল্লে—আমি তোমাদের দেশের কথা কিছু-কিছু জানি। আমার মনে হয় যে, আমাদের উভয়ের অবস্থাই সমান।

দীপক হাসতে-হাসতে বল্লে—হ্যাঁ আমাদের উভয়ের অবস্থা যে সমান তাতে আর সন্দেহ কি! তবে সামান্য একটু তফাৎ এক জায়গায় আছে।

আনা জিজ্ঞাসা করলে—কি তফাৎ?

দীপক বল্লে—এই খাঁচায় বন্ধ সুস্থ পাখী আর নিজের বাসায় শুয়ে থাকা আহত পাখীর মধ্যে যা তফাৎ।

আনা একটু চুপ কোরে থেকে বল্লে—দীপ তোমার জীবনের কথা আমায় বল্‌বে না?

—বল্‌ব বৈ কি! শোনো তবে।

দীপক আনাকে তার জীবনের কথা বল্‌তে লাগ্‌ল। আনা নির্বাক হোয়ে তার কথা শুনে গেল। দীপকের বর্ণনা শেষ হোলে আনা বল্লে—আমি তোমার সম্বন্ধে যা আন্দাজ করেছিলুম তা ঠিক। এত লোকের মধ্যে তোমাকে দেখেই আমার মনে হয়েছিল যে তুমি এ দলের লোক নও। তুমি এদের চেয়ে অনেক উচ্চ শ্রেণীর লোক।

আনার শুশ্রূষায় দীপকের মাথাটা ছেড়ে গিয়েছিল। সে তার কথা শুনে ধড়মড় কোরে উঠে বসে বল্লে—তুমি কি এদের নিম্নশ্রেণীর লোকে বলে মনে কর?

আনা বল্লে—নিম্নশ্রেণীর, অত্যন্ত নিম্নশ্রেণীর!

—সে কি! তুমি যে আমায় অবাক করলে আনা!

আনা জোর কোরে বল্লে—আমি ঠিক বল্‌ছি। তুমি হয়ত বল্‌বে যে এরা সাধারণ মানুষের চেয়ে ঢের উঁচু। এদের

নিজেদের মনের ধারণাও তাই। কিন্তু আমি বল্‌ব যে এরা অত্যন্ত সাধারণ মানুষ। তার ওপরে রূপদক্ষের ভান কোরে এরা লোক ঠকায়, এমনকি নিজেদের পর্য্যন্ত ঠকায়।

দীপক অত্যন্ত অসহিষ্ণুভাবে বল্লে—আনা তোমার কথাগুলো পরিস্কার কোরে বল। আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

আনা বল্লে—বল্‌ছি—। তাই বলবার জন্যই আজ আমি সেধে তোমার ঘরে ঢুকেছি, না বলে যাব না।

আনা বল্‌তে লাগ্‌ল—তুমি যাদের সঙ্গে বাস করছ, যাদের জীবনকে তুমি আদর্শ-জীবন বলে মনে কর তাদের আমি প্রায় সকলকেই চিনি। প্যারীতে এসে অবধি এদের দেখছি। তুমি বলতে চাও যে, এরা রূপদক্ষ কিন্তু আমি বলি যে এরা কিছুই নয়। এদের জীবনে উদ্দামতা আছে, ভবিষ্যতের ধার এরা ধারে না সত্য কিন্তু সেইটেই তো জীবনের সর্ব্বস্ব নয়। এইভাবে জীবন যাপনের মধ্যে যে একটা মাদকতা আছে আশা করি সেটুকু স্বীকার করবার মতন সাহস তোমার আছে?

দীপক বল্লে—তোমার যা বক্তব্য বলে যাও আনা, আমায় এখন প্রশ্ন কোরো না।

আনা বল্লে—এই মাদকতার প্রলোভনেই এরা সংসারের সমস্ত দায়িত্ব ও বন্ধনকে অস্বীকার কোরে এই উচ্ছৃঙ্খলতায় জীবন-তরী ভাসিয়ে ছুটেছে। রূপদক্ষের সাধনা, তার সংযম এদের মধ্যে কোথায়? কবিতা লিখতে অথবা ছবি আঁকতে

পারলেই রূপদক্ষ হয় না। কবিতা রচনা করা, ছবি আঁকা বা অভিনয় করাটাকেই এরা জীবনযাত্রার উপায় করেছে। এদের তুমি দু-বেলা খাওয়া আর হুল্লোড়ের মাল-মসলা জুগিয়ে যাও—দেখবে আর তারা কবিতাও লিখবে না—ছবিও আঁকবে না। তোমাকে দেখে আমার মনে হয় যে তুমি পৃথিবীতে বড় কাজ করবার জন্য এসেছ। তুমি এই আবর্ত্তের মধ্যে পড়ে নিজেকে হারিও না। কারণ তোমার কর্ত্তব্য এদের চেয়ে ঢের বেশী। সাবধান! একবার এই আবর্ত্তের মধ্যে পড়্‌লে আর নিজেকে বাঁচাতে পারবে না। এইটুকু বলবার জন্য আমি কদিন ধরে অবসর খুঁজ্‌ছিলুম, আজ বলে গেলুম। যদি এর মধ্যে কিছু অন্যায় কথা বলে থাকি তা হোলে আমায় ক্ষমা কোরো।

এই বলে আনা ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল। আনা চলে যাবার পরও দীপক অবাক হোয়ে খাটের উপরে বসে রইল। আনার কথাগুলো তখনো তার মাথার মধ্যে ঝন্‌-ঝন্‌ কোরে বাজ্‌ছিল। গত দু-দিন ও দু-রাত্রি ধরে সে তার বন্ধুদের সঙ্গে হল্লা করেছে। বন্ধুরা তাকে অজ্ঞান অবস্থায় তার ঘরে শুইয়ে দিয়ে গিয়েছিল। প্রায় বারো ঘণ্টার পর তার ঘুম ভেঙেছে। আনা যে কথাগুলো এতক্ষণ ধরে বল্লে তার প্রকৃত অর্থ দীপকের মগজের মধ্যে ভাল কোরে ঢুকছিল না। কিছুক্ষণ চুপ কোরে খাটের ওপরে বসে থেকে সে আবার শুয়ে পড়্‌ল।

আনা তাদের বাড়ীতে নতুন এসেছে। সে তাঁদের সঙ্গে মেলামেশা করত বটে কিন্তু সব সময়েই সে নিজের চারিদিকে এমন একটা গণ্ডি দিয়ে রাখ্‌ত যে কিছুতেই তার খুব অন্তরঙ্গ হওয়া যেত না। দীপকের সঙ্গে আনার ইতিপূর্ব্বে আরও অনেকবার অনেক বিষয়ে কথাবার্ত্তা হয়েছে কিন্তু এ যাবৎ সে তাকে অতি অকিঞ্চিৎকর বলেই মনে কোরে এসেছে। আজ তার এই নতুন পরিচয় পেয়ে দীপক দস্তুরমতন চিন্তান্বিত হোয়ে উঠ্‌ল। কিন্তু ধারাবাহিক চিন্তা করবার মতন মস্তিষ্কের অবস্থা তখন তার ছিল না। একটু অগ্রসর হোতে না হোতেই তার চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে যেতে লাগ্‌ল। শেষকালে বিরক্ত হোয়ে সে ঘুমোবার চেষ্টায় মন দিলে।

দীপকের যখন ঘুম ভাঙ্‌ল তখন বেলা একেবারে পড়ে গিয়েছে। অতিরিক্ত মদ্যপানের পর শরীর ও মন অবসন্ন। তার বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে কেউ উঠে বেরিয়ে গিয়েছে কেউ বা তখনো পড়ে ঘুমুচ্ছে। দীপক জামা গায়ে দিয়ে কিছু খাবার চেষ্টায় বাইরে বেরিয়ে গেল।

বড় রাস্তার ধারে ফুটপাতের ওপরে একটা কাফেতে বসে সে খাবার আনতে হুকুম দিলে। চোখের সামনে চওড়া রাস্তা দিয়ে নানা রকমের গাড়ী ছুটেছে। শ্বেত নারীরা পুরুষের অঙ্গে ঢলে পড়ে হাসতে-হাসতে এগিয়ে চলেছে। এ সব দৃশ্য দীপকের চোখে এতদিন বেশ মধুর ঠেকেছিল। কিন্তু সেদিন তার চোখে প্যারীর এই দৃশ্য, নারীদের এই হাবভাব ও বিলাস-সজ্জা যেন অত্যন্ত বিসদৃশ ঠেকতে লাগ্‌ল। তার কি জানি মনে হচ্ছিল, এই যে সমারোহ এর পশ্চাতে একটা বিরাট হাহাকার রয়েছে। মানুষের অবয়ব যতই সুন্দর হোক না কেন তার অন্তরের রূপই তো আসল রূপ। বাহিরের এই

প্রাচুর্য্য যতই নয়নমুগ্ধকর হোক না কেন এর পশ্চাতে যে দারিদ্র্য ও অভাবের ক্ষুধা এই বিলাস তারই একটা সুদৃশ্য আবরণ মাত্র। চিন্তায় বিভোর হোয়ে দীপক একদিকে চেয়ে আছে এমন সময় তার নজর পড়্‌ল, তার দিকে চেয়ে একটি তরুণী একটু হেসে চলে গেল। তার চিন্তার গতি অন্যমুখে ফিরে গেল। সে তরুণীর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। তরুণী ক্রমে তার দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল।

সেদিন সকালে আনা তাকে যে কথাগুলো বলেছিল দীপক মনে-মনে তারই আলোচনা করতে লাগ্‌ল। সে ভাবতে লাগ্‌ল আনা তাকে হঠাৎ এ কথাগুলো বলে গেল কেন? সত্যিই কি সে মনে করে যে পৃথিবীতে কোন বড় কাজ করবার জন্য আমি জন্মেছি। দীপকের মনে হোলো—আমি কি করতে পারি! আমার শক্তি কতটুকু! কিন্তু তখুনি তার অন্তরের সুপ্ত পৌরুষ গর্জ্জে উঠ্‌ল—আমি কিনা করতে পারি! আমার অন্তরে যে শক্তি আছে—কিন্তু তার মনের এই উত্তেজনা মুহূর্ত্তের মধ্যেই কমে গেল। আবার তার মনে হোলো—তাইত আমি কি করতে পারি! দেশ ছেড়ে কেন আমি চলে এসেছি? এখানে এসে এই ক'বছরে আমি কি করেছি! নাই নাই আমার কোনো শক্তিই নাই—হায়রে নিশার স্বপন!

দীপক কাফে থেকে উঠে রাস্তায় পায়চারী করতে আরম্ভ করলে। এই দীপালোকিত রাজপথে বেড়াতে-বেড়াতে শ্বেত নারীদের দেহশোভা তার মনে কতদিন কত লালসাই জাগিয়ে

তুলেছে কিন্তু সেদিন তার চারপাশের কোনো জিনিষই তার মনের মধ্যে একটা আঁচড় কাট্‌তেও পারছিল না। তার খালি মনে হোতে লাগল যেন সে আরব্য উপন্যাসের কোন এক মায়া-রাজ্যে এসে পড়েছে। এখান থেকে পালাবার পথ আর নাই। কেন যে তার এ কথা মনে হচ্ছিল তার কারণ সে নিজেই খুঁজে পাচ্ছিল না। শেষকালে বিরক্ত হোয়ে সে বাড়ীতে ফিরে গেল। একতলা দোতলা পার হোয়ে তাদের তলায় উঠে সে নিজের ঘরের দিকে যেতে-যেতে দেখ্‌লে, আনার ঘরে আলো জল্‌ছে। দীপক থম্‌কে সেখানে দাঁড়িয়ে গেল। আনার ঘরের দরজা খোলা ছিল, সে টেবিলে বসে কি একখানা বই পড়্‌ছিল। ভেতর থেকে সে দীপকের দিকে চেয়ে দেখলে কিন্তু তাকে কোনো সম্ভাষণ করলে না। দীপকও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল।

পরের দিন সকাল বেলা আনা আবার দীপকের ঘরে এসে উপস্থিত হোলো। সে জিজ্ঞাসা করলে—দীপ তুমি কি আমার ওপরে বিরক্ত হয়েছ ?

দীপক বল্লে—না কেন তোমার এ কথা মনে হোলো বল দিকিন ?

—কাল সন্ধ্যাবেলা আমার ঘরের সাম্‌নে অতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলে ভেতরে এলে না যে ?

--ও এই জন্য ? আমি ভাব্‌লুম তুমি কি কাজ করছ এখন গেলে বোধ হয় তোমার অসুবিধা হবে।

আনা বল্লে—হ্যাঁ আমি একটা বিশেষ কাজ করছিলুম। তুমি তখন গেলে আমার অসুবিধা হোতো।

দীপক হাস্‌তে-হাস্‌তে বল্লে—তবে? আমি যাই-নি বলে কোথায় আমাকে ধন্যবাদ দেবে না উল্টে আবার অভিযোগ! মেয়েরা এই রকমই বটে!

আনা বল্লে—আচ্ছা থাম। মেয়েদের নিন্দে নিজেদের মধ্যেই কোরো। মেয়েদের সাম্‌নে ওটা করতে নেই।

একটু চুপ কোরে থেকে আনা আবার বল্লে—আজ দুপুরে তোমার কোনো কাজ আছে? আমার সঙ্গে একটু বেরুবে?

দীপক হাসতে-হাসতে বল্লে—যেখানে কাজ থাকে তার তল্লাট দিয়ে আমি হাঁটি না। সে আজই কি আর কালই কি? তবে—

আনা বল্লে—আবার 'তবে' কি! আমার সঙ্গে বেরুতে ভয় হয় বুঝি?

দীপক বল্লে—তা একটু হয় বৈকি? তোমার মতন একজন সুন্দরী তরুণীর পাশে আমার মতন একটি কালো চেহারা রাস্তা দিয়ে চল্লেই দুনিয়ার লোক হাঁ কোরে চেয়ে থাক্‌বে আর আমায় অভিসম্পাত দেবে।

—থাক্‌গে, মিছিমিছি কেন তুমি লোকের অভিসম্পাত কুড়োবে, বলে আনা ক্রোধের অভিনয় কোরে উঠে পড়ল।

দীপক টপ্ কোরে ওর হাতখানা ধরে বল্লে—বোঁসো বোসো, রাগ কোরে চলে যেও না।

আনা হাত ছাড়িয়ে নিতে-নিতে বল্লে—হাত ছাড়, তুমি ভারি অসভ্য। তোমার সঙ্গে আর মিশ্‌ব না।

দীপক তাকে বসিয়ে বল্লে—ভবিষ্যতে আর মিশো না। কিন্তু আজ যখন এসেছ তখন তার দণ্ডভোগ করতে হবে। কোথায় যেতে হবে শুনি?

আনা বসে বল্লে—তুমি প্রায়ই লুভ্‌রের আর্ট গ্যালারীতে যাও শুনি। আমি এতদিন প্যারীতে আছি কিন্তু দু-বারের বেশী সেখানে যাই-নি। আজকে আমার কোনো কাজ নেই, আমায় নিয়ে যাবে?

দীপক বল্লে—বেশ তা হোলে তুমি ঠিক হোয়ে থাক, আমি তোমায় ডেকে নিয়ে যাব।

সেদিন দীপক আনার আর এক নতুন পরিচয় পেলে। আর্ট গ্যালারীতে ঘুরতে-ঘুরতে সে স্পষ্ট বুঝ্‌তে পার্‌লে যে আনা এ সব বিষয়ে তার চেয়ে অনেক বেশী জানে। আর্ট ও সাহিত্য সম্বন্ধে সে কিংবা তার বন্ধুদের চেয়ে আনার জ্ঞান অনেক বেশী এবং সে জ্ঞান অত্যন্ত পরিষ্কার। এই একদিনেই সে দীপককে অনেকখানি আকর্ষণ কোরে নিলে।

পরদিন দীপক আনার ঘরে গিয়ে বল্লে—আজকে গ্যালারীতে যাবে না?

সেদিন আনার ছুটি ছিল না তাই যাওয়া হোলো না।

সন্ধ্যাবেলা কর্ম্মস্থল থেকে বাড়ীতে ফিরে আনা প্রায়ই আর কোথাও যেত না। তার একলার সংসারে ছোট্ট গৃহস্থালীর

কাজকর্ম্ম সারতে অনেক সময় কেটে যেত। তারপর সে বই নিয়ে বস্‌ত কিংবা স্বরলিপি লিখ্‌ত। দীপকের সন্ধ্যার পর আর কোনো কাজ থাক্‌ত না। সকাল থেকে বিকেল পর্য্যন্ত সে বসে লিখ্‌ত কিন্তু সন্ধ্যার পর ছিল তার ছুটি। আনার সঙ্গে তার নতুন কোরে এই পরিচয় হবার পর থেকে সন্ধ্যার পর সে আনার ঘরে গিয়ে জুট্‌তে আরম্ভ কর্‌লে। এইখানে বসে সে আনার সঙ্গে ভারতীয় দর্শন, ভারতীয় সঙ্গীত ও নানা বিষয়ে আলোচনা ও তর্ক কর্‌ত। এমনি কোরে দীপক ও আনা তাদের দলের মধ্যে থেকেও দল থেকে বিচ্ছিন্ন হোয়ে পড়্‌তে লাগ্‌ল। শেষে এমন দিন এল যে, সন্ধ্যার সময়টুকু দীপক আনাকে ছেড়ে থাকৃতে প্বার্‌ত না। সমস্ত দিনটী বসে-বসে সে এই সান্ধ্য-মিলনের স্বপ্ন দেখ্‌ত।

একদিন আনা দীপককে বল্লে—তোমাদের দলের দুই একজন লোকের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, তাদের সঙ্গে আলাপ কর্‌বে ?

দীপক আশ্চর্য্য হোয়ে বল্লে—আমাদের দল! আমাদের দলে লোকের মধ্যে তো শুধু তুমি আর আমি। এর মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তিকে টেনে আনতে আমি রাজি নই।

একটু চুপ কোরে থেকে দীপক জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কি বল আনা, আমাদের দলে আর লোক নেবার স্থান আছে কি ?

আনা এতক্ষণ মুখ নীচু কোরে বসেছিল। দীপক উত্তরের প্রতীক্ষায় তার মুখের দিকে চেয়ে রইল। কিছুক্ষণ সেই ভাবে

থেকে আনা মুখ তুলে দীপকের মুখের দিকে চাইলে। দীপক আনার চোখের সে দৃষ্টি দেখে চম্‌কে উঠল। সে মনে করেছিল তার কথার জবাবে হয়ত আনা তার স্বভাবসুলভ কোমলতার সঙ্গে মৃদু প্রতিবাদ করবে অথবা কৃত্রিম রাগ প্রকাশ কোরে বল্‌বে—বেরোও আমার ঘর থেকে। কিন্তু আনার এ দৃষ্টি কি কঠিন, কি নির্ম্মম! তার মনে হোতে লাগ্‌ল, সে চাহনি যেন তার চোখ ভেদ কোরে তার অন্তর, তার অজ্ঞাতমানসলোকে কি সন্ধান করছে। তার সেই সুন্দর মুখমণ্ডল দেখতে-দেখতে এমন পরুষভাব ধারণ করলে যে তার ইচ্ছা করতে লাগ্‌ল চোখ দুটো ফিরিয়ে নিয়ে সেই মুহূর্ত্তে ছুটে সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করে। কিন্তু কিছুতেই সে তার চোখ থেকে নিজের দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারলে না।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই আনার সেই কঠিন মুখ আবার হাসিতে সমুজ্জ্বল হোয়ে উঠল। সে বল্লে—না দীপ, আমাদের মধ্যে আর তৃতীয় ব্যক্তির স্থান হবে না। তবুও এরা যখন তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায় তখন একবার দেখা কর না!

আনার দৃষ্টি দীপকের মনের মধ্যে যে অস্থিরতার তরঙ্গ তুলেছিল তখনও তা শান্ত হয়-নি। সে আম্‌তা-আম্‌তা কোরে বল্লে—বেশ।

আনা বল্‌তে লাগ্‌ল—এদের দু-একজনের সঙ্গে আগে আমার আলাপ ছিল। আজ একজনের সঙ্গে দেখা হওয়ায় সে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, আমি তোমায় চিনি কি না? তোমার

সঙ্গে আমার পরিচয় আছে জেনে সে তোমার সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিতে আমাকে অনুরোধ করেছে। আমি যে তাকে কথা দিয়েছি দীপ।

দীপক এবার শান্তভাবে বল্লে—বেশ তাকে নিয়ে এস।

পরদিন সন্ধ্যার সময় আনার সঙ্গে একটি ভারতীয় যুবক দীপকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এল। লোকটি বল্লে—আমরা আপনার নাম শুনেছি। আপনি অনেকদিন হোলো ইউরোপে এসেছেন তাও জানি। এতদিন আপনার সন্ধান পাইনি। আপনাকে কি আমাদের দলস্থ বলে মনে করতে পারি?

দীপক লোকটীর কথা শুনে আশ্চর্য্য হোয়ে গেল। কাল আনা তাঁকে একটা দলের কথা বলেছিল বটে কিন্তু দীপক মনে করেছিল বোধ হয় তারাও ভারতবাসী বলে আনা তাদের এক দলের লোক বলেছে। এখন সে স্পষ্ট বুঝতে পারলে যে, এর মধ্যে আরও কিছু আছে।

সে বল্লে—আমায় আর একটু স্পষ্ট কোরে বলুন। আপনাদের কি দল তা আমি তো জানি না।

লোকটি একবার আনার দিকে চাইলে। তারপরে তার দিকে ফিরে বল্লে—দেখুন ইউরোপ ও আমেরিকায় একদল ভারতীয় আছেন যাঁরা তাদের দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত দেখতে চান। এই সব লোকদের একটা সঙ্ঘ আছে, তাঁদের বিশেষ কাজ আছে। আমরা চাই যে আপনিও সেই সম্প্রদায়ে যোগ দেন।

দীপক এই সম্প্রদায়ের কথা আগে শুনেছিল। এদের দু-চার জনের সঙ্গে লণ্ডন ও প্যারীতে তার যে আলাপ পরিচয় না হয়েছে এমনও নয়। সে বল্লে—দেখুন আমার বিশ্বাস যে, ভারতের বাইরে কিংবা ভারতের ভিতরে এমন কোনো অভাগ্য ভারতবাসী নেই যে ভারতের মুক্তির কামনা করে না।

লোকটি একটু হেসে বল্লে—হ্যাঁ, কিন্তু কেবল মাত্র ইচ্ছার দ্বারাই তো কার্য্য সিদ্ধ হয় না, সেজন্য চেষ্টা করা প্রয়োজন।

দীপক বল্লে—অবশ্য, কিন্তু সে চেষ্টার ধারা আমার জানা চাই। সে ধারার ওপরে আমার বিশ্বাস থাকা চাই।

লোকটি বল্লে—দেখুন দেশকে সেবা করবার প্রণালী নিয়ে তর্ক করা যেতে পারে। কিন্তু দেশের প্রতি ভালবাসা—অর্থাৎ আমাদের ঐ গোড়ার কথাটা—ওটা নিয়ে তো আর কোনো মতদ্বৈধ নেই, ওখানে আপনারও যা মত আমারও তাই মত।

দীপক বল্লে—ঠিক ঐ কথাটা নিয়ে আমার কারুর সঙ্গে মতদ্বৈধ নেই। আপনাকে তো আগেই বলেছি যে, দেশে বিদেশে সকল ভারতবাসীর পক্ষেই স্বদেশের মুক্তির কামনা করা সহজ, সঙ্গত ও স্বাভাবিক। কিন্তু এ কথা আমি কিছুতেই স্বীকার করতে পারি না যে ভারতবাসী মাত্রেই দেশ-হিতৈষী।

—যেমন—

—যেমন—শাসক সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ থাকাটা খুব স্বাভাবিক বটে কিন্তু সেটাকেই দেশ-হিতৈষণা বলে ভুল করবার বয়স অন্তত আমার কেটে গেছে।

দীপক একটু চুপ কোরে থেকে আবার বল্লে—দেখুন কিছু মনে করবেন না। এই আপনাদের কথাই বলি। আপনারা দেশ-হিতৈষী আমি ধরে নিচ্ছি। ইংরেজী ভাষায় চিঠি ছাপিয়ে ডিরেক্টারী দেখে ভারতবর্ষে ইংরেজী ভাষায় অভিজ্ঞ লোকদের সেই সব চিঠি পাঠিয়ে শাসক সম্প্রদায়কে আপনারা বিচলিত করতে পারেন। কিন্তু ভারতবাসীর শৃঙ্খল এত কায়েমী যে এই সব কাগজের কামান দেগে তার স্থায়িত্ব আরও পাকা কোরে দেওয়া ছাড়া আরও কিছুই হওয়া সম্ভব নয়। ভারতের যে দৌর্ব্বল্য সে তার অন্তরের। এ দৌর্ব্বল্য যদি ঘোচাতে চান তো ভারতে ফিরে যান। সেখানে গিয়ে কাজ করুন। পুলিশে গ্রেপ্তার করবে এই ভয়ে ইউরোপে বসে থেকে অথবা হিমালয়ের গহ্বরে বসে সাধনা কোরে দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দেবার স্বপ্ন দেখার দিন নেই।

এর পর সেদিনকার মত তাদের আলোচনা বন্ধ হোলো। এই সম্প্রদায়ে ষোলো-আনা যোগ না দিলেও কিছুদিন ঐ দলের লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করতেই সে পুলিশের নজরে পড়ে গেল। এমন কি এই সম্পর্কে তার নাম দু-একবার সংবাদ পত্রেও প্রকাশ হোয়ে গেল।

একদিন সন্ধ্যাবেলা আনা তার কর্ম্মস্থল থেকে অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থায় ফিরে এসে দীপককে গোপনে বল্লে—দীপ আমায় একবার পেট্রোগ্রাডে যেতে হবে।

দীপক চমকে উঠে বল্লে—সর্ব্বনাশ! সেখানে কেন?

আনা বল্লে—আমার সেই খুড়ীর কথা তোমায় বলেছি। আজ সংবাদ পেলুম যে, তিনি পেট্রোগ্রাডে লুকিয়ে আছেন। সেখান থেকে তাঁকে নিয়ে পালিয়ে আস্‌তে হবে।

দীপক জিজ্ঞাসা করলে—কি কোরে পালাবে?

আনা বল্লে—সে ব্যবস্থা আমি করেছি। তুমি আমার সঙ্গে যাবে?

দীপক বল্লে—আমাকে যেতে দেবে কেন?

আনা বল্লে—তার ব্যবস্থাও আমি করেছি। তুমি যাবে কিনা বল?

দীপক বল্লে—বেশ আমি গেলে যদি কোন উপকার হয় তা হোলে যেতে রাজি আছি।

আনা দিনকয়েক ঘোরাঘুরি কোরে কি সব ব্যবস্থা করলে। তারপর সে আর দীপক সঙ্গোপনে ছদ্মবেশে পোট্রোগ্রাড রওনা হোলো।

ভারতীয় বিপ্লববাদীদের সঙ্গে দিনকতক মেলামেশা করায় দীপকের প্রতি পুলিশের তীক্ষ্ণ নজর পড়েছিল। হঠাৎ সে প্যারী থেকে উধাও হওয়ায় তার খোঁজ পড়্‌ল। কিছুদিনের মধ্যেই তারা টের পেয়ে গেল যে, সে, রুষিয়ায় চলে গেছে। তার প্রতি এতদিন যা সন্দেহ করা হচ্ছিল এই ব্যাপারে সে সব সত্য বলে প্রতীয়মান হোতে লাগ্‌ল। সে যে এই বিপ্লববাদীদের একজন নেতা এ সম্বন্ধে পুলিশের কর্ত্তাদের কোনো সন্দেহই রইল না। সেটা আবার পুলিশের খাতা

থেকে বিচিত্ররূপে পল্লবিত হোয়ে একদিন সংবাদপত্রের অঙ্গে ফুটে বেরুল।

দীপকের নামে যখন সেখানে সমালোচনার অন্ত নেই, সে তখন বাইরের জগৎ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হোয়ে পেট্রোগ্রাডের একটি সংকীর্ণ গলির মধ্যে এক বাড়ীতে বসে আনার সঙ্গে তার খুড়ীকে নিয়ে প্যারীতে পলায়নের ষড়যন্ত্রে ব্যস্ত। শহরে তখন রক্তের স্রোত বইছে। উন্মত্ত জনসঙ্ঘ রাজরক্তে শহরের রাস্তা কর্দ্দমাক্ত কোরে তুলেছে। এদের মধ্যে তার খুড়ীকে নিয়ে পালাবার চেষ্টা ও তার অসীম সাহস দেখে দীপক অবাক্ হোয়ে গেল।

তাদের পলায়নের পথ প্রায় পরিষ্কার হোয়ে এসেছে এমন সময় একদিন সকালবেলা দীপক সংবাদ পেলে যে, লাল পল্টনের লোকেরা আনা যে বাড়ীতে থাকৃত সেই বাড়ী চড়াও হোয়ে তার খুড়ীকে ধরে নিয়ে গেছে। আনা তাদের অত্যাচারে বাধা দিতে গিয়েছিল, তারা যাবার সময় সঙ্গীনের খোঁচায় তাকে জর্জ্জরিত কোরে চলে গিয়েছে। আনার আদেশ-মত দীপক দিনের বেলায় রাস্তায় বেরুত না। কিন্তু তার অবস্থা শুনে সে জীবন তুচ্ছ কোরে তার কাছে ছুটে গেল।

দীপক গিয়ে দেখ্তে পেলে যে, আনাকে ঘিরে তারই মতন গুটিকয়েক নিরাশ্রয়া মেয়ে বসে আছে। আনার চক্ষু মুদ্রিত, তার বুক মাথা ও হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। দীপক ঘরে ঢুকৃতেই তারা তাকে নিয়ে গিয়ে আনার বিছানার ধারে বসিয়ে দিলে।

একটি মেয়ে বল্লে—অজ্ঞান হোয়ে যাবার আগে পর্য্যন্ত সে তোমার নাম করেছে।

দীপক আনার পাশে বসে তার একখানা হাত নিজের হাতের ধ্যে নিলে। অত্যধিক রক্তপাতে দেহ তার হিম হোয়ে এসেছিল। সে একবার তার নাড়ী পরীক্ষা কোরে দেখলে অত্যন্ত ক্ষীণ। অনেকক্ষণ আচ্ছন্নের মতন থাকার পর আনা একবার চোখ চাইলে। দীপককে দেখে তার বেদনা-কাতর মুখখানা হাসিতে উদ্ভাসিত হোয়ে উঠল। মুমূর্ষুর মুখের সেই হাসি দেখে দীপকের চোখে জল দেখা দিল। আনা কি বল্‌তে চেষ্টা করছিল কিন্তু দীপক তাকে কথা বল্‌তে বারণ কোরে তার কপাল থেকে চুলগুলো মাথার ওপরে তুলে দিতে লাগ্‌ল।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই রহস্যময়ী আনার জীবাত্মা রহস্যময় লোকে চলে গেল। তার বন্ধুরা—যাদের কাছে সে তার খুড়ীকে লুকিয়ে রেখেছিল তারা গোপনে দীপককে পেট্রোগ্রাড থেকে বের কোরে দিলে। আনার দেহ সমাধিস্থ হবার আগেই দীপক প্যারীর দিকে রওনা হোলো।

বিশ্বমোহন ছিলেন নীতিপরায়ণ লোক। জ্ঞানত তিনি কোনো অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ কোরে চল্‌তে পারতেন না। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর একমাত্র পুত্র দীপককে সব দিক দিয়ে মানুষ কোরে তুল্‌তে। পাছে সুমনার মাতৃস্নেহের ধারায় তার মনের কোনো আগাছা বেড়ে ওঠে এই আশঙ্কায় তিনি সেই বাল্যকালে দীপককে মিঃ হোম্‌সের শিক্ষাধীনে রেখেছিলেন। এইজন্যই দীপক সম্বন্ধে তাঁকে সর্ব্ববিষয়ে কঠোর হোতে হয়েছিল। এই কঠোরতার নীচে ফল্গুধারার মত যে নির্ম্মল সন্তানস্নেহের প্রবাহ ছিল তা কেউ বুঝতেও পারত না।

রাজদ্রোহের অপরাধে দীপক যখন ধরা পড়ল তখন বিশ্বমোহন সত্যই বিস্মিত হয়েছিলেন। প্রথমে তাঁর মনে হয়েছিল যে, দীপক বাস্তবিক দোষী নয় হয়ত সন্দেহে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কিন্তু তিনি ছিলেন বিচক্ষণ ব্যবহারাজীব। দীপকের মামলার তদন্ত করতে গিয়ে তিনি স্পষ্টই বুঝতে পারলেন যে, সে দোষী। দীপক সম্বন্ধে এই প্রথম ধাক্কায় তিনি যতখানি বিস্মিত হয়েছিলেন দুঃখিত হয়েছিলেন তার চেয়ে

অনেক কম। বিশ্বমোহন মনে করেছিলেন যে, এর পরে দীপক তার কৃত কার্য্যের জন্য অনুতপ্ত হবে এবং তাঁকে সুখী করবার জন্য আবার সে মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করবে। কিন্তু দীপক পালিয়ে যাবার পর তিনি যে আঘাত পেলেন তা আর সাম্‌লে উঠ্‌তে পারলেন না। এই ঘটনায় তাঁর মন ও শরীর দুই ভেঙে পড়্‌ল। সেই থেকে তিনি দীপকের নাম মুখেও আনতেন না। তার প্রসঙ্গ কোথাও হোলে তিনি চুপ কোরে থাকতেন।

দীপকের পলায়নের কিছু পরেই বিশ্বমোহন আবার এমন একটি আঘাত পেলেন যার ফলে তিনি একেবারে ভেঙে পড়লেন।

ব্যারিষ্টারী পাশ কোরে সুকুমারের ফিরে আসবার কথা ছিল। কিন্তু তাকে বারম্বার লেখা সত্ত্বেও সে ফির্‌ছে না দেখে বিশ্বমোহন তার সম্বন্ধে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন যে, অনেকদিন আগেই সে সেখানে বিয়ে কোরে দস্তুরমতন সংসার ফেঁদে বসে আছে। শান্তিকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন। যাতে এই পিতৃমাতৃহারা মেয়েটী তাঁদের সংসারে এসে কোনো রকমে কষ্ট না পায় এজন্য তাঁর চেষ্টা ও যত্নের অন্ত ছিল না। তার এই দুর্ভাগ্যের জন্য তিনি নিজেকে দায়ী মনে করতে লাগলেন এবং এজন্য কিছুতেই নিজেকে ক্ষমা ক্‌রতে পারছিলেন না।

ভাদ্র মাস। ক'দিন থেকে যেমন অসহ্য গরম তেমনি বৃষ্টি সুরু হয়েছে। প্রকৃতি দেবী একাধারে দীপক আর

মল্লারের স্থর ভাঁজচেন। সেদিন সকাল-বেলা বিশ্বমোহন ড্রইং-রুমে বসে আছেন। তাঁর কাছে শান্তি আর অন্থু বসে আছে। শীগ্‌গীরই হাইকোর্টের ছুটি হবে। এই ছুটিতে বিশ্বমোহন তাঁর বাড়ীর সবাইকে নিয়ে ইউরোপে বেড়াতে যাবার বন্দোবস্ত করেছেন। সকালে বসে প্রত্যহ তাঁদের আজকাল সেই আলোচনাই হয়।

বিশ্বমোহনের কিছুদিন থেকে ভয়ানক কাজের তাড়া পড়ায় তাড়াতাড়ি বেরুতে হচ্ছে বলে স্থমনা ব্যস্ত আছেন। সেদিন সকালে তিনি মনোযোগ দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছিলেন আর অন্থু তাঁকে নানা রকম প্রশ্ন করছিল।

অন্থু জিজ্ঞাসা করলে—হ্যাঁ বাবা, ইফেল-টাওয়ার মন্থমেণ্টের চেয়ে কতগুণ উচু ?

এই ক'দিন ধরে বিশ্বমোহন অন্থুর এই প্রশ্নের যে কতবার উত্তর দিয়েছেন তার ঠিকানা নেই। এবারে তিনি কোনো জবাব না দিয়ে কাগজ পড়ে যেতে লাগলেন। অন্থু তার প্রশ্নের জবাব না পেয়ে আবার আব্দারের স্থরে জিজ্ঞাসা করলে—বল না বাবা—কি দিন-রাত কাগজ পড়্‌ছ—

অন্থুর শেষ কথাগুলো বিশ্বমোহন বোধ হয় শুনতে পেলেন না। তিনি কাগজ পড়্‌তে-পড়্‌তে হঠাৎ চীৎকার কোরে উঠলেন—স্থমনা—স্থমনা—

স্থমনা পাশের ঘরেই স্বামীর পোষাক গুছিয়ে রাখছিলেন তাঁর ডাক শুনে তিনি ডইং-রুমে আস্‌তেই বিশ্বমোহন চেয়ার

ছেড়ে উঠে অত্যন্ত উত্তেজিত হোয়ে বল্‌তে লাগ্‌লেন—সুমনা এই দেখ, তোমার ছেলে আবার কি কাণ্ড করেছে!

বিস্মিত সুমনার মুখ দিয়ে প্রথমে কোনো কথা বেরুল না। তিনি একবার শান্তি ও একবার অনুর মুখের দিকে চাইতে লাগ্‌লেন। কিন্তু বিশ্বমোহনের হঠাৎ এই উত্তেজনার কারণ তারাও বুঝতে পারে-নি। সবাইকে নিরুত্তর দেখে বিশ্বমোহন আবার চেয়ারে বসে বল্লেন—হতভাগা আবার ঐ দলে মিশ্‌লে—এবার কে তাকে বাঁচাবে!

সুমনা, শান্তি ও অনু সবাই এক সঙ্গে বলে উঠ্‌ল—এঁ্যা?

বিশ্বমোহন বল্‌তে লাগ্‌লেন—মিশেছে কি! সে তাদের দলের একজন চাঁই হোয়ে উঠেছে। তাদের পেছনে যে দিনরাত টিক্‌টিকির দল ঘুরে বেড়াচ্ছে তা জানে না। সে কি করতে রুষিয়ায় গিয়েছে—এই দেখ—।

এই অবধি বলে বিশ্বমোহন খবরের কাগজখানা এগিয়ে দিলেন। সুমনা, শান্তি ও অনু তিনজনেই কাগজখানার ওপরে ঝুঁকে পড়্‌লেন।

সেদিনকার টেলিগ্রামে এইটেই ছিল প্রধান খবর। দীপকের রুষিয়া যাওয়ার ব্যাপারটা তারা নিজেদের সন্দেহের রং দিয়ে দিব্যি একটি সংবাদ তৈরি কোরে প্রকাশ করেছিল। সেই সঙ্গে দীপক যে এখানকার বিপ্লববাদীদের একজন চাঁই ছিল এবং এই সম্পর্কে একবার ধরা পড়ে কোনো রকমে অব্যাহতি পেয়েছিল সে কথা লিখতেও তারা ভুলে যায়-নি।

সংবাদটা পড়ে তাঁরা তিনজনেই মুখ তুলে বিশ্বমোহনের দিকে চেয়ে দেখলেন যে, তাঁর চোখ দুটো অস্বাভাবিক রকমের লাল হোয়ে উঠেছে। সুমনা তাঁর সেই মূর্ত্তি দেখে ভয় পেয়ে কাছে সরে এসে তাঁর গায়ে হাত বুলোতে-বুলোতে বল্লেন—থাক্‌গে, তুমি আর তার কথা ভেবো না। সে যখন আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছে তখন তার ওপরে আমাদের আর কোনো দায়িত্ব নেই।

বিশ্বমোহন অশ্রুজড়িত কণ্ঠে বল্লেন—বড় আশা করেছিলুম সুমনা—ছেলেটার ওপরে বড় আশা করেছিলুম—

তিনি আর কথা বল্‌তে পারলেন না। শান্তি কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। সে বল্লে—মামা আপনার অসুখ কর্‌ছে, একটু শোবেন চলুন।

বিশ্বমোহন অত্যন্ত শ্রান্তভাবে বল্লেন—মা জননী, আমায় এক গেলাস জল দাও তো।

শান্তি জল আন্‌তে চলে গেল। বিশ্বমোহন আবার বল্‌তে লাগ্‌লেন—সুমনা, আমি কিন্তু ও ছেলেকে আমার বিষয়ের একটি পয়সাও দেব না। আমি আজই উইল কর্‌ব। এখুনি আমায় বেরুতে হবে। অনু আমাকে স্নানের জল দিতে বল্।

অনু চলে গেল। সুমনা তখনো স্বামীর গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে-দিতে নীরবে কাঁদছিলেন। তাঁর গাল গড়িয়ে এক ফোঁটা তপ্ত অশ্রুজল বিশ্বমোহনের গায়ে পড়্‌তেই তিনি চম্‌কে উঠে স্ত্রীর দিকে চাইলেন। সুমনাকে কাঁদতে দেখে তিনি গভীর

প্রেমভরে তাঁকে নিজের কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে এসে বল্লেন—সুমনা, আমি জ্ঞানত কখন কারুর কোনো অনিষ্ট তো করি-নি। কিন্তু ভগবান আমাদের এমন শাস্তি দিলেন কেন?

সুমনা কোনো উত্তর দিলেন না। অশ্রু তাঁর কণ্ঠ রোধ কোরে রইল। বিশ্বমোহন আবার বল্লেন—সুমন, আমাদের বিয়ের পর সেই সুখের দিনগুলো মনে কর। কত আশা, উৎসাহ ও আনন্দ নিয়ে সংসারপথে আমরা যাত্রা করেছিলুম। দেখ শান্তির কি দশা হোলো! আমাদের বড় আশার দীপক—তার প্রতি স্নেহের কি প্রতিদানই সে আমাদের দিলে!

সুমনা এবার বল্লেন—ওগো তুমি আর ও-সব কথা ভেবো না, ভগবানের যা ইচ্ছা তাই পূর্ণ হবে।

শান্তি জল নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল। বিশ্বমোহন তার হাত থেকে গেলাসটা নিয়ে জল খেয়ে বল্লেন—মা জননী, তোমাদের কাপড়-চোপড় সব তৈরী হোয়ে গেছে তো? আমাদের যেতে কিন্তু আর পনেরো দিনও নেই।

তারপর তিনি সুমনার দিকে ফিরে বল্লেন—কিন্তু সুমনা, আমি ঐ ছেলেকে একটি পয়সাও দিয়ে যাব না, একথা তোমাদের বলে রাখ্‌ছি।

এই বলে তিনি স্নানের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে স্নানের ঘরের দরজা ভেঙে দেখা গেল মৃত্যুর শীতল হস্ত বিশ্বমোহনের সমস্ত জ্বালা নিবারণ কোরে দিয়ে গেছে। তৎক্ষণাৎ চিকিৎসক ডাকা হোলো। তিনি

পরীক্ষা কোরে বল্লেন—হঠাৎ মাথায় অত্যধিক রক্ত সঞ্চালিত হওয়ায় শির ছিঁড়ে মৃত্যু হয়েছে।

* * *

বিশ্বমোহনের মৃত্যুর পর স্থমনা গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। তিনি স্থির করলেন যে, এই বিছানায় পড়ে থেকে না খেয়ে শরীর পাত করবেন আর উঠ্‌বেন না। শান্তি কেঁদে-কেঁদে চোখ ফুলিয়ে ফেল্লে আর অন্থ—বাবাগো বলে তাঁর মৃতদেহ জড়িয়ে পড়ে রইল।

বাড়ীতে সেই তিনটী প্রাণী সকলেই মনে করলে, কি কোরে তারা দিন কাটা্‌বে, বিশ্বমোহনের অভাবে কেমন কোরে তারা বাঁচ্‌বে! কিন্তু সকলকেই বাঁচ্‌তে হোলো। স্থমনাই প্রথমে উঠে সবার মুখে জল দিলেন।

কালাশৌচ পেরিয়ে গেল। যে ক্ষতকে তারা অক্ষয় মনে করেছিল কাল তার ওপরে প্রতিদিন তার অমোঘ বিশল্যকরণীর প্রলেপ দিয়ে যেতে লাগ্‌ল। শোকের সেই উদ্দামতা ক্রমে অন্তঃসলিলা হোয়ে গেল। কেবলমাত্র বিশ্বমোহনের বাৎসরিক শ্রাদ্ধের দিন স্থমনা আর কান্না চেপে রাখতে পারতেন না। শান্তি সেদিন সমস্তক্ষণই দীপকের ঘরে বসে নীরবে তার স্নেহময় মামার স্মৃতিতে অশ্রু ঝরিয়ে দিত। আর অন্থ, তার অত কথা মনেই থাকৃত না। হেসে খেলে গান গেয়ে তার দিন কেটে যেতে লাগ্‌ল।

দীপক প্যারীতে ফিরে এসেই সংকল্প করলে যে, সে ভারতবর্ষে ফিরে যাবে। লণ্ডন থেকে প্যারীতে এসে সে ভারতবর্ষ, নিজের আত্মীয় স্বজন এবং সংসার সম্বন্ধে আপনার বল্‌তে যা কিছু বোঝায় সব ভুল্‌তে চেষ্টা কোরেও ভুল্‌তে পারছিল না। কিন্তু আনার সঙ্গে তার পরিচয় হবার পর নিজের অজ্ঞাতসারে সে সবাইকেই ভুলে বসেছিল। আনার ব্যক্তিত্ব এবং তার প্রভাব তাকে যে কতখানি আচ্ছন্ন কোরে রেখেছিল অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিকভাবে তাকে হারিয়ে সে তা বুঝতে পারলে। দেশের প্রতি তার যা কর্ত্তব্য সে বিষয়ে সে এর পূর্ব্বে অনেক ভেবেছে এবং আনার সঙ্গে আলোচনাও কম করে-নি। এই কর্ত্তব্য-বুদ্ধি তাকে তখনো ঠিক পথ যদিও দেখাতে পারছিল না তবুও সে এটুকু বুঝতে পারছিল যে, এখানে বসে থাক্‌লে জন্মভূমির প্রতি তার যা কর্ত্তব্য আছে তা সম্পন্ন করা হবে না। কিন্তু দেশে ফেরবার কথা মনে হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই তার মনে হোলো যে সেখানে তাকে একজন মস্ত বিপ্লববাদী বলে ধরে

নেওয়া হয়েছে। সেখানে ফিরলেই হয়ত তাকে গ্রেপ্তার করা হবে এবং বিচারে প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত হোতে পারে। কিন্তু তবুও সে বিদেশে স্থির হোয়ে বসে থাকতে পারছিল না। তার দেহ মন দেশে ফেরবার জন্য উচাটন হোয়ে উঠ্‌ল। তার মনে হোতে লাগ্‌ল যে, সেখানে যদি তার প্রাণদণ্ডও হয় তাতেও তার জন্মভূমির মঙ্গল হবে। এই স্থির কোরে আবার একদিন প্যারীর বন্ধু-বান্ধবদের অগোচরে জাহাজে চড়ে ভারতবর্ষের দিকে সে পাড়ি দিলে।

দীপকের অনুমান বৃথা হয়-নি। বোম্বাই বন্দরে পা দেওয়া মাত্র তাকে গ্রেপ্তার করা হোলো। তাকে যে কি অপরাধে গ্রেপ্তার করা হোলো তা সে জান্‌তেই পারলে না। সে মনে করলে বিচারের সময় হয়ত অপরাধের কথাটা তাকে জানিয়ে দোষ ক্ষালন করবার সুযোগ দেওয়া হবে। কিন্তু কার্য্যত কিছুই করা হোলো না। একদিন কি দু-দিন তাকে সেখানে রেখে একেবারে বর্ম্মার এক জেলখানায় তাকে বন্দী কোরে রেখে দেওয়া হোলো।

এই জেলের মধ্যে বছর দুয়েক কাটাবার পর একদিন জেলার এসে দীপককে সংবাদ দিলে যে, ভারত-সম্রাটের অনুগ্রহে সে মুক্তিলাভ করেছে। দীপককে তারা কলকাতা অবধি পৌঁছে দিয়ে গেল।

প্রায় এগারো বছর পরে বাড়ী ফিরে দীপক দেখলে যে, সেখানকার হাল-চাল একেবারে বদ্‌লে গেছে। তার পিতার

মৃত্যু হয়েছে, তার মা কোনো রকমে জীবন ধারণ করছেন, শান্তির হাতে সংসারের সমস্ত ভার। বাড়ীর মধ্যে এক অনু ছাড়া আর কারুর মুখেই হাসি নেই।

তাদের বাগানে যে জমি পড়েছিল অনু সেখানে টেনিস্ খেলবার ব্যবস্থা করেছিল। প্রত্যহ বিকেলে অনেক তরুণ তরুণী সেখানে খেলতে আস্ত। এদের মধ্যে অনেককেই দীপক চেনে না, আবার অনেককেই সে ছোট দেখেছে।

দীপক বাড়ীতে আসার পর অনু দিনকতক তাকে নিয়ে মেতে উঠ্ল। কয়েক দিনের মধ্যেই অনুর অনেক বন্ধুই দীপকের ভক্ত হোয়ে উঠ্ল। টেনিস খেলার পর তাদের যে চায়ের আড্ডাটি বস্ত ক্রমে সেটা বড় বাড়ীর ড্রইং-রুম থেকে সরে দীপকের বাড়ীর বারান্দায় জম্তে লাগ্ল।

বাড়ীতে ফিরে এসে দীপক আবার তার সেই বাগানের কোনে ছোট্ট বাড়ীটিতে গিয়ে ঢুকেছিল। বন্ধ্যা নারী যেমন কোরে তার পালিত পশুটীকে যত্ন করে ঠিক সেই রকম যত্নে এই দশ এগারো বছর ধরে শান্তি দীপকের সেই ঘরটীর যত্ন নিয়েছে। দীপক প্রত্যহ রাত্রি-বেলা এসে যেমন পরিস্কার পরিচ্ছন্ন বিছানায় শুয়ে পড়্ত ঠিক এগারো বছর পরে বাড়ী ফিরেও সে তেমনি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ঘরে গিয়ে ঢুকল। ঘর দেখে তার একবারও মনে হোলো না যে, সে এতদিন এই বাড়ী ছাড়া হোয়ে বাস করছিল।

বাড়ীতে এসে সবার আগে দীপককে বিষয়-কর্ম্মে মন দিতে

হোলো। বিশ্বমোহন তাকে তাঁর নিজের অর্জ্জিত বিষয় থেকে বঞ্চিত করবার সংকল্প কোরেই মারা যান। কিন্তু তিনি কোনো উইল না করায় দীপকই সমস্ত সম্পত্তির মালিক হোলো। হঠাৎ বিশ্বমোহনের মৃত্যু হওয়ায় তাঁর বিষয়াদির অবস্থাও অনেক স্থানে অত্যন্ত বিশৃঙ্খল অবস্থায় ছিল। এই সবের ব্যবস্থা করতেও তার অনেকদিন কেটে গেল।

অর্থের প্রতি দীপকের খুব টান না থাকলেও এটা সে বুঝতে পেরেছিল যে অর্থ না থাকলে নিজের কিংবা দেশের কোনো কাজেই হাত দেওয়া যায় না। নিজের বিষয়ের ব্যবস্থা করতে করতে সে একদিন তাদের এটর্ণির কাছে শুনতে পেলে যে, সুকুমার বিলেত থেকে তার সমস্ত বিষয় বিক্রি কোরে সেখানে টাকা পাঠিয়ে দেবার জন্য তাগাদা করছে। সেইদিনই সন্ধ্যার পর তাদের আড্ডা ভেঙে গেলে দীপক শান্তিকে সমস্ত কথা বলে বল্লে—বৌদি, তুমি একটা আবেদন কোরে আপাতত বিষয়-বিক্রিটা বন্ধ কোরে দাও। তার সমস্ত চালাকী আমি বের কোরে দিচ্ছি। সে মনে করেচে কি!

শান্তি সমস্ত কথা শুনে চুপ কোরে রইল। দীপক বল্লে—কালই বিকেলে আমি এটর্ণীকে ডেকে নিয়ে আস্‌ব। যা লেখবার সে লিখে নিয়ে আস্‌বে তুমি শুধু একটা সই কোরে দেবে।

শান্তি এবারও চুপ কোরে রইল দেখে দীপক বল্লে—বৌদি কোনো কথা কচ্ছ না যে?

শান্তি বল্লে—তুমি কি আমায় দু-মুঠো খাবার আর বছরে খানকয়েক কাপড় দিতে পারবে না ?

শান্তির কাছ থেকে এমন কথা শোনবার প্রত্যাশা দীপক কল্পনাতেও কখনো করে-নি। সে চম্‌কে উঠে জিজ্ঞাসা করলে—কেন! কেন এ কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ছ ?

শান্তি বল্লে—আগে আমার কথার উত্তর দাও।

দীপক ক্ষুব্ধস্বরে বল্লে—বৌদি, তুমি যেদিন থেকে আমাদের বাড়ীতে এসেছ সেদিন থেকে আজ এই মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমাদের বাড়ীর কেউ কখনো তোমার আজকের এই প্রশ্ন করবার মতন ব্যবহার করেচে ?

শান্তি বল্লে—না, এতদিন এ কথা কখনো আমার মনে হয়-নি কিন্তু আজ এই মাত্র তোমার মুখ থেকে এমন কথা শুনলুম যে প্রশ্নটা না কোরে থাকতে পারলুম না। তুমি—যে আমায় সব থেকে বেশী চেনে—যে আমার আশৈশব বন্ধু—যাকে আমি—

দীপক বলে উঠ্‌ল—বৌদি চুপ কর—চুপ কর—দোহাই তোমার—তুমি আমায় ভুল বুঝ না।

শান্তি চুপ করলে। দীপকও কিছুক্ষণ কোনো কথা বল্‌তে পারলে না। একটু পরে নিস্তব্ধতা ভেঙে শান্তি চেয়ার থেকে উঠে এসে দীপকের পাশে বসে মিনতির স্বরে বল্লে—ঠাকুরপো আমায় মাপ কর ভাই, আমি না বুঝে কথাটা বলে ফেলেছি।

দীপক তখনো কিছু বল্লে না। শান্তি আবার বল্লে—এখনো

তোমার রাগ পড়ে-নি বুঝতে পারচি। যাক্ আমার ওপরে তুমি বেশীক্ষণ রাগ কোরে থাকতে পারবে না।

শান্তির কথা শুনে দীপক হেসে ফেলে বল্লে—তোমার কথাটা মার কানে একবার তুলে দিতে পারলে হয়।

শান্তি বল্লে—অপরাধের চূড়ান্ত শাস্তিটা না দিতে পারলে বুঝি তোমার আশ্ মিট্‌ছে না—না?

দীপক বল্লে—যাক্, তা হোলে আবার কাজের কথাটা আরম্ভ করি। সুকুমার দা—

শান্তি তার মুখের কথাটা শেষ করতে না দিয়েই বলে উঠল—থাম—ও নাম আমার কাছে আর কোরো না। তার বিষয়ের একটি পয়সাও আমার চাই না। সে বিষয়ের কোনো অংশ নিয়ে যদি কোনো দিন আমার ভরণ-পোষণ চালাতে হয় তা হোলে সেটা ভিক্ষে কোরে জীবন ধারণের চাইতে আমার কাছে দুর্ভাগ্যের কারণ হবে—বুঝলে?

এই বলে শান্তি উঠে চলে গেল। কিন্তু দরজা অবধি গিয়েই সে আবার ফিরে এসে বল্লে—কথাগুলো তোমার শুনতে খুব খারাপ লাগল, না? কারণ তার সম্পর্ক নিয়েই তো তোমাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক। সে হোলো তোমাদের ভাই—আর আমি কে?

এই কথাগুলো বলে শান্তি ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল। দীপক অবাক হোয়ে চুপ কোরে বসে রইল।

দীপক মুক্তি পাবার আগেই তার পুরোনো বন্ধুরা, যাদের

দ্বীপান্তর হয়েছিল তাদের সকলকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। দীপক ফিরে এসেই তাদের সঙ্ঘবদ্ধ করবার চেষ্টা করলে কিন্তু তারা আর কেউ তার আহ্বানে তেমন কোরে সাড়া দিলে না। জেলের মধ্যে এই দশ বৎসর কঠোর শাসনে তাদের অনেকের মনেই সংসারের অনিত্যতা সম্বন্ধে সংশয় ঘুচে গিয়েছিল। তাদের কেউ বা তখন সন্ন্যাসী, কারুর বা জীবনমধু নিঃশেষিত, কেউ বা চাকরীর চেষ্টায় ঘুরে-ঘুরে ক্লান্ত, কেউ বা ঘিয়ের দোকান কোরে কায়ক্লেশে দিন কাটাচ্ছে। যাদের বিরুদ্ধে তারা অস্ত্র ধারণ করেছিল তারা তাদের দেশ-প্রেমের প্রতি সম্মান দেখিয়ে মুক্তি দিয়েছে কিন্তু যাদের মুখ চেয়ে জীবনকে তুচ্ছ কোরে তারা মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল—সেই নিজের দেশবাসীদের অবহেলায় মন তখন তাদের তিক্ত।

বন্ধুদের কাছে থেকে এই ভাবে প্রত্যাখ্যাত হোয়ে দীপকের উৎসাহ অনেকখানি খর্ব্ব হোয়ে গেল। তার প্রতিবাসী ও বন্ধু অবনীও মুক্তি পেয়েছিল কিন্তু দীপক বাড়ীতে ফিরে এসে তাকে দেখতে পায়-নি। কারণ সে তখন শিমলা শৈলে বাস করছিল। দীপক কিছুদিন তার জন্য অপেক্ষা কোরে শেষকালে তাকে কলকাতায় ফিরে তার সঙ্গে যোগ দিতে লিখ্‌লে। কিন্তু শিম্‌লা থেকে অবনীর যা উত্তর এল তার তাৎপর্য্য হচ্ছে—মনে কর আমার মৃত্যু হয়েছে। তোমার কি মনে হয় যে, শৈল-শিখরে বসে আমি বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করচি? না বন্ধু তা নয়। এখানে এসেছি বাবার হুকুমে চাকরীর খোঁজে। শিগ্‌গীর

কলকাতায় ফিরে যাব বটে কিন্তু যখন যাব তখন হাত-পা এমন ভাবে বাঁধা পড়্‌বে যার তুলনায় দ্বীপান্তর-বাসও ছিল ভাল।

চারিদিক থেকে এইভাবে আঘাত পেয়ে-পেয়েও কিন্তু দীপক একেবারে নিরাশ হোতে পারলে না। একদিন সে শান্তিকে ডেকে বল্লে— বৌদি, এবার তো আমাদের আর কোনো বাধা নেই, এস এবার আমাদের কাজ আরম্ভ করি।

কিন্তু দশ বৎসর আগে শান্তি তার আহ্বানে যেমন ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তেমন কোরে ঝাঁপিয়ে পড়া তো দূরের কথা সে তার আহ্বানে সাড়া পর্য্যন্ত দিলে না। শান্তিকে চুপ কোরে থাক্‌তে দেখে দীপক জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কি বৌদি, চুপ কোরে রইলে যে?

শান্তি তার স্বভাবসিদ্ধ ম্লান হাসি হেসে বল্লে— কি বল্‌ব?

দীপক বল্লে—কি বল্‌ব বল্লে চল্‌বে না। তোমাকে আমাদের মধ্যে আস্‌তেই হবে। তুমি হচ্ছ আমার শক্তি। আজ চারদিক থেকে প্রত্যাখ্যান পেয়ে তোমার কাছে এসেও যদি ঐ কথা শুনি—তা হোলে—তা হোলে আমি কি নিয়ে থাক্‌ব বৌদি।

শান্তি বল্লে—আমি সংসার নিয়ে থাকি। সবাই যদি বাইরের কাজ নিয়ে পড়ি তা হোলে সংসার যে ভেসে যাবে। দেশের প্রতি সকলের যেমন কর্ত্তব্য আছে তেম্‌নি নিজের সংসারের প্রতিও সকলের কর্ত্তব্য আছে। এই সংসারের সমষ্টি নিয়েই তো দেশ?

শান্তির উত্তরে দীপক কোনো জবাব দিতে পার্‌লে না।

সে তাদের কাজে যোগ দিতে চাইচে না দেখে দীপক অত্যন্ত আহত হোলো। পুরোনো বন্ধুদের কাছ থেকে কেবলই প্রত্যাখ্যাত হোয়ে দীপকের কাজের উৎসাহ ক্রমেই কমে আসছিল কিন্তু তার আশা ছিল যে, ছেলেবেলা থেকে আজ পর্য্যন্ত তার সমস্ত কার্য্যের উৎসাহদাত্রী ও আশৈশব বন্ধু শান্তি কর্ম্মক্ষেত্রে তার পাশে এসে দাঁড়াবে। তাই সবার কাছে তাড়িত হোয়েও সে আশা ছাড়ে-নি। কিন্তু শান্তিরও এই পরিবর্ত্তন দেখে সে নিরুৎসাহ হোয়ে পড়্ল।

দীপক তার খাটে একটা বালিশে হেলান দিয়ে এতক্ষণ কথাবার্ত্তা বলছিল, শান্তির কথাটা শুনে সে বালিশে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়্ল।

দীপককে চুপ কোরে থাক্‌তে দেখে শান্তি বল্লে—ঠাকুরপো তুমি কাজে লাগ, আমি এখানে থেকে তোমার সেবা করি—এই ভাল।

অভিমান-ক্ষুব্ধ স্বরে দীপক বল্লে—বেশ, সেই ভাল।

সেদিন শান্তির সঙ্গে দীপকের এ সম্বন্ধে আর কোনো কথা হোলো না। সেদিন কি একটা কাজের জন্য সমস্ত দিন ঘুরে বেড়াতে হওয়ায় দীপকের শ্রান্তি এসেছিল, সে আর কিছু না বলে চোখ বুঁজিয়ে পড়ে রইল।

শান্তি কিছুক্ষণ চুপ কোরে বসে থেকে চেয়ার ছেড়ে খাটের ধারে দীপকের পাশে বসে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—ঠাকুরপো, ঘুমুলে নাকি?

দীপক কোনো সাড়া দিলে না। শান্তি আবার বল্লে—অবেলায় ঘুমিও না। অসুখ করবে।

দীপক এবারও কোনো জবাব দিলে না। শান্তি আর একটু বসে সে ঘুমিয়ে পড়েচে মনে কোরে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

দীপক ঘুমোয়-নি। সে শুয়ে-শুয়ে ভাবতে লাগল—কি করি! ইউরোপ থেকে ফিরে আসবার পর এতদিন ধরে সে মনের মধ্যে যত কাজের ছক্ এঁকে রেখেছিল হঠাৎ যেন সেগুলো সব এলেমেলো হোয়ে যেতে লাগ্ল। শান্তির কথাগুলো তার অন্তরের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে প্রবেশ কোরে তাকে আকুল কোরে তুল্লে। বারো বছর আগে আর এক সন্ধ্যায় এই ঘরে বসে তার মুখে স্কুল করবার প্রস্তাব শুনে শান্তি কি রকম আবেগে তার সঙ্গে যোগ দিতে চেয়েছিল, তার সেই উৎসাহোজ্জ্বল মুখখানা দীপকের আজিকার নিরাশার তমসায় ঢাকা মনের মধ্যে একবার দপ্ কোরে জ্বলে উঠল। সঙ্গে-সঙ্গে তার মনে পড়ল, তার জীবনের সঙ্গে সেই সময় আরও একটি মেয়ে জড়িত হয়েছিল। যদিও শান্তির মত উৎসাহের ঝড় নিয়ে সে আসে-নি, সে এসেছিল তার সন্দেহজড়িত শক্তি নিয়ে, সে এসেছিল শুধু তার আহ্বানে। সংসারের সেই ভীষণ ঝটিকায় সে যদি তার জীবন থেকে চিরদিনের মতন হারিয়ে না যেত তা হোলে সে বোধহয় আজ তার কথা এমন-ভাবে প্রত্যাখ্যান করতে পারত না। দীপকের মনে হোতে লাগ্ল, স্বাতী আজ

কোথায়! যদি তার সঙ্গে স্বাতীর তখন বিয়ে হোতো! দীপক জোর কোরে স্বাতীর চিন্তা মন থেকে মুছে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগ্‌ল। সে মনে-মনে বল্‌তে লাগ্‌ল—স্বাতী যেখানেই থাক— সে সুখে থাক।

দীপক জীবনে বিশেষ কোনো ব্যক্তির জন্য এতখানি আন্তরিকতার সঙ্গে মঙ্গল-চিন্তা করে-নি। তার নিজের চিন্তায় সে নিজেই হেসে ফেল্লে।

স্বাতীর চিন্তা বন্ধ কোরে দিয়ে দীপক অন্য চিন্তায় মন দিলে। তার মনে হোতে লাগ্‌ল—দূর হোক্ গে ছাই, এ সব পাগলামী ছেড়ে দিয়ে বিয়ে থা কোরে অন্য সবাই যেমন দিন কাটাচ্ছে তেমনি দিন কাটাতে থাকি। কিন্তু এ চিন্তা মনের মধ্যে আসামাত্র সে ধড়মড় কোরে উঠে বস্‌ল। তারপর তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের সেই ছোট্ট বারান্দায় জোরে পায়চারী কোরে বেড়াতে আরম্ভ কোরে দিলে।

দীপকের পাগলামী কিন্তু সারল না। বিশ্বমোহন মারা যাবার আগে বালীগঞ্জ থেকে কিছু দূরে অনেক জমি কিনে রেখেছিলেন। তাঁর আশা ছিল কালে এ জমির অনেক দর হবে। দীপক ঠিক করলে যে, এই জমিতে সে এক আদর্শ উপনিবেশ করবে। পুরোনো বন্ধুরা তাকে সাহায্য করবার আশা না দিলেও তার চারদিকে যে নতুন ভক্তের দল গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে থেকেই জন-কয়েককে নিয়ে সে কাজে নেমে গেল।

দীপক প্রত্যহ ছেলেদের নিয়ে সকালবেলা তাদের সেই জমিতে গিয়ে মাপ-জোক জরিপ স্থরু কোরে দিতেই চারিদিকে হৈ-হৈ রব পড়ে গেল। অনেকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হোয়ে তার কাজে যোগ দিতে লাগ্‌ল। দেখে শুনে দীপকের নির্ব্বাপিত উৎসাহে ঘৃতাহুতি পড়্‌ল। সে মহা উৎসাহে নতুন দল নিয়ে কর্ম্মসাগরে লাফিয়ে পড়্‌ল।

উপনিবেশের যখন এই রকম গোড়াপত্তন চলেছে সেই সময় একদিন চারু বলে একটি ছেলে এসে তাকে বল্লে—দীপদা

আপনার কাজে আমাকে নিন্ না। আমি তো পড়াশুনো শেষ কোরে ঘরে বসে আছি, আমার ইচ্ছা যে আমি দেশের কাজে নিজেকে উৎসর্গ করি।

চারু দীপকের চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। তারা তাদের প্রতিবাসী হোলেও দীপক যখন গৃহত্যাগ করে তখন চারুর বাব নিজেদের বাড়ী ভাড়া দিয়ে শহরের মধ্যে থাকতেন। তিনি সরকারী বড় চাকরী করতেন এবং সেইখান থেকেই আফিস করবার সুবিধা হোতো বলেই এই ব্যবস্থা ছিল। এই দূরে থাকার জন্য চারুদের সঙ্গে দীপকদের আগে তেমন জানাশোনা ছিল না। অনুর চেষ্টায় বিকেলে ও সন্ধ্যায় তাদের বাড়ীতে তরুণ-তরুণীদের যে মজলিশ জমে উঠেছিল চারু ছিল তার একজন প্রধান সভ্য। অনুর সঙ্গে চারুর যে ভাব খুব বেশী তা সে মজলিশের সকলেই জান্‌ত। দীপকও কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করছিল যে, তাদের দুজনের মধ্যে এই যে টান তা বন্ধুত্বের টানের চেয়ে অনেক বেশী। তার মা-ও এ বিষয়ে দীপককে দু-একবার বলেছিলেন। এই বন্ধুত্ব শীগ্‌গীরই একটা বন্ধনে পরিণত হবার কোনো সম্ভাবনা আছে কিনা তাই নিয়ে শান্তির সঙ্গে তার পরামর্শও হয়েছে।

চারু হঠাৎ দীপককে এই অনুরোধ করায় সে চিন্তিত হোয়ে পড়্‌ল। দীপক জান্‌ত যে, সে যে কাজ করে সে কাজকে তার মা ও তাদের আত্মীয়-স্বজনরা কেউই খুব সুনজরে দেখেন না। যে ব্যক্তির সঙ্গে দু-দিন বাদে তার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হোয়ে ওঠ্‌বার

সম্ভাবনা আছে তাকে তার সেই লক্ষ্মীছাড়ার দলের মধ্যে টেনে নিতে দীপকের সঙ্কোচ বোধ হোতে লাগ্‌ল। অথচ এ কথা চারুকে স্পষ্ট কোরে খুলে বলাও যায় না। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই চারুর উৎসাহ দীপকের সঙ্কোচ ও দ্বিধাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। তার আগ্রহ ও আন্তরিকতা দেখে দীপক তাকে তার দলে টেনে নিলে।

দীপক প্রথমে তার জমি কতকগুলো ভাগে ভাগ কোরে নিলে। প্রজাদের থাকবার বাড়ী, হাসপাতাল, দপ্তর ইত্যাদি আলাদা-আলাদা স্থানে নির্দ্দিষ্ট হোলো। দশ বারোটা কূয়ো তৈরি হোলো। কতকগুলো কাপড় কাচবার, কতকগুলো পানীয়ের জন্য এবং কতকগুলোতে চাষের জমিতে জল দেবার জন্য পাম্প লাগান হোলো।

বিস্তর অর্থ ব্যয় কোরে বসবাসের স্থান হোলো বটে কিন্তু মুস্কিল বাধ্‌ল থাকবার লোক নিয়ে। দীপক নিয়ম করলে, তাদের উপনিবেশে যারা বাস করবে তাদের সকলকেই কি হিন্দু কি মুসলমান একই কূয়ো থেকে জল নিতে হবে। নিজের বাড়ীর মধ্যে ছাড়া উপনিবেশের মধ্যে পূজার জন্য মন্দির অথবা মসজিদ তৈরি করতে পারবে না। যার যা ইষ্টদেবতা সে বাড়ীতে বসেই তার উপাসনা কর্‌বে। উপনিবেশের মধ্যে মৃতদেহের সৎকার চল্‌বে না। কবর অথবা দাহ যে যাই করুক তা বাইরে করতে হবে। প্রথম তিন বছর কারুকে খাজনা দিতে হবে না। তিন বছর পরে বাড়ীর ভাড়া ও জমির খাজনা লাগ্‌বে। প্রত্যেক

ঔপনিবেশিকের রোগের সময় ঔষধ ও পথ্য উপনিবেশের তহবিল থেকে দেওয়া হবে।

দীপকের উপনিবেশে এত সুবিধা সত্ত্বেও কিন্তু লোক এল না। তার চেলারা দিনকতক গ্রামে ঘুরে-ঘুরে জনকয়েক লোক ধরে আনলে। তিন বছর খাজনা দিতে হবে না ও রোগ হোলে বিনামূল্যে ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা শুনে তখুনি তারা সেখানে আসতে রাজী হোলো। কিন্তু দিন কয়েক যাতায়াতের পরই যখন তারা শুনলে যে, সেখানে মন্দির অথবা মসজিদ করতে দেওয়া হবে না তখুনি তারা ভড়্‌কে গেল। তারা বল্লে—হুজুর যদি ধর্ম্মে বাধা দেন তবে কেমন কোরে আপনার রাজ্যে বাস করি!

দীপক তাদের বোঝাতে চেষ্টা করলে যে, কারুর ধর্ম্মে সে বাধা দিচ্ছে না। কিন্তু সে কথা তারা কিছুতেই বুঝতে চাইলে না। তারা মনে করলে যে, এর মধ্যে জমিদারের নিশ্চয় কোনো অভিসন্ধি আছে। কোনো-কোনো চালাক লোক বল্লে যে, ক্রীশ্চানদের মত উপকারের টোপ্‌ দিয়ে সে প্রজাদের পাইকারী দরে ব্রাহ্ম করবার মতলবে এই ফিকির করেছে। তারপরে কিছুদিন বাদে তারা যখন শুন্‌লে যে,দীপক মিত্র বোমার দলে ছিল তখন রহস্য পরিষ্কার হোয়ে গেল। কিন্তু রহস্যটা পরিষ্কার হোলেও প্রকাশ করবার অজ্ঞতার জন্য তারা সে বিষয়ে স্পষ্ট কোরে কিছুই বল্‌তে পারলে না। তারা শুধু বল্লে—হুজুর আমরা গরীব লোক।

তাদের এই বনিয়াদী গরীবিয়ানা কেড়ে নেবার যে কোনো অভিসন্ধিই দীপকের নেই এ কথা সে কিছুতেই তাদের বুঝিয়ে উঠ্‌তে পারলে না।

দীপকের যে সব ভক্ত ও চেলারা উৎসাহ কোরে এই কাজে কোমর বেঁধে লেগেছিল তাদের প্রথম উদ্যমই এইভাবে ব্যর্থ হোয়ে যায় দেখে একদিন তারা বল্লে—দীপদা আচ্ছা ফ্যাসাদ করেছেন। মন্দির বা মসজিদ তৈরি কর্‌তে না দিলে লোকে আস্‌বেই বা কেন?

দীপক বল্লে—ফ্যাসাদ যা হবার তা কাজ আরম্ভ করবার আগে হোয়ে যাওয়াই ভাল।

চারু বল্লে—তা বলে লোকে ধর্ম্ম-কর্ম্ম করবে না? এতো আপনার ভারী অত্যাচার!

দীপক একটু হেসে বল্লে—দেশ-শুদ্ধ লোকই তো ধর্ম্মকর্ম্ম কর্‌চে। আমরা না হয় জনকতক অধার্ম্মিক লোককে নিয়েই কাজ আরম্ভ করলুম।

চারু কোনো উত্তর না দিয়ে ক্ষুণ্ণ হোয়ে বসে রইল।

দীপক আবার বল্লে—কাজটা সুরু করা যাক, তারপর যদি দেখা যায় ধর্ম্মকর্ম্মের অভাবে লোকগুলো মারা যায়-যায় হয়েছে তখন না হয় ঔষুধের ব্যবস্থা করা যাবে।

ভক্তরা আবার গ্রামে-গ্রামে ঘুরতে আরম্ভ করলে।

দীপকের উপনিবেশে থাকবার লোকের অভাব হোলেও সেখানে কাজের অভাব ছিল না। সে সকালবেলা সেখানে

গিয়ে ভবিষ্যতে যারা এসে বাস করবে তাদের সুবিধার জন্য প্রত্যহ নতুন-নতুন উপায় উদ্ভাবন করত। দু-তিন দিন ধরে তাই নিয়ে তার চেলাবৃন্দ, শান্তি ও অন্নুর সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক পরামর্শ কোরে লোকজন নিয়ে সেই কাজে লেগে যেত। এই রকম কোরে পুরোনো স্মৃতিগুলোকে সে আবর্জ্জনার মতন মন থেকে সরিয়ে ফেলে কাজের উত্তেজনায় সেই ফাঁকটুকু ভরিয়ে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগ্‌ল।

* * * * * * * * *

সেদিন দীপক সন্ধ্যার আগেই বাড়ীতে ফির্‌বে বলে ঠিক করেছিল। সে জানতে পেরেছিল যে অবনী সেদিন শিমলা থেকে ফিরবে। ইউরোপ থেকে ফিরে অবধি অবনীদের বাড়ীতে সে ঢোকে-নি। কারণ তাদের বাড়ীতে তখন কেউ ছিল না। অবনীর মা অনেকদিন আগেই মারা গিয়েছেন। স্বাতীও স্বামীর সঙ্গে বিদেশে থাকে। দীপক এতদিন আশান্বিত হৃদয়ে অবনীর প্রতীক্ষা করছিল। আজ সে আস্‌বে জেনে মন তার পুলকে নৃত্য করছিল। কিন্তু সন্ধ্যার কিছু আগে সে এমন একটি কাজের ফেরে পড়ে গেল যে তা শেষ কোরে বেরুতে তার অন্য দিনের চেয়ে দেরীই হোয়ে গেল। সে সেখান থেকে বেরিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ীমুখো পা চালিয়ে দিলে।

কৃষ্ণপক্ষ রাত্রি। হন্‌-হন্‌ কোরে সরু রাস্তা দিয়ে দীপক এগিয়ে চলেছে। সঙ্গে চারু কিংবা অন্য কেউ নেই। ক'দিন থেকে তাদের টেনিসের মরশুম চলেছে বলে বিকেলেই তারা

সরে পড়ছিল। চলতে-চলতে একটা সরু গলি-পথের মোড়ে একটু গোঙানি আওয়াজ শুনে দীপক দাঁড়িয়ে গেল। কিছুক্ষণ আর কোনো শব্দ নেই। মনের ভুল মনে কোরে আর দু-এক পা অগ্রসর হোতেই আবার যেন কটা কাতেরোক্তি তার কাণে এসে পৌছল। এবারে সে সরু গলিটার মধ্যে ঢুকে যেদিক থেকে গোঙানীর শব্দটা এসেছিল সেদিকে এগিয়ে গেল। কিছুক্ষণ খোঁজা-খুঁজির পরই সে দেখতে পেলে একটা ঝোপের পাশে যেন কে পড়ে রয়েছে। দীপক একটু এগিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—কে! কে এখানে শুয়ে?

কোনো সাড়া নেই। দীপক আবার জিজ্ঞাসা করলে—কে তুমি? এখানে এ রকমভাবে পড়ে রয়েচ কেন?

এবারেও কোনো উত্তর না পেয়ে সে দেশলাই জাল্‌লে। দেশলাইয়ের আলোতে দেখা গেল, যে পড়ে রয়েছে সে একটি মেয়ে। আবার একটি কাঠি জেলে মুখের কাছে ধরে সে ভালো কোরে দেখলে যে মেয়েটী সংজ্ঞাহীনা।

ব্যাপারটা যে কি হোতে পারে দীপক তা ভেবে ঠিক করতে পারছিল না। একবার তার মনে হোলো মেয়েটীকে বোধহয় সাপে কামড়েছে। কাছাকাছি লোকালয়ও নেই। সেখান থেকে হাসপাতাল অনেক দূরে। ভেবে-চিন্তে সে ঠিক করলে একে বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করাই ঠিক। আর দেরী না কোরে দু-হাত দিয়ে পাঁজাকোলা কোরে মেয়েটীকে তুলে সে বাড়ীর দিকে একরকম ছুট দিলে।

দীপকদের বাড়ী সেখান থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে। রাস্তায় লোকজন গাড়ী কিছুই নেই। সেই অন্ধকার রাস্তা দিয়ে অপরিচিতা অচৈতন্যা কিশোরীকে নিয়ে সে কখনো দৌড়ে কখনো হেঁটে চল্‌তে লাগ্‌ল।

কিছু দূর এইভাবে যেতে না যেতেই সে শ্রান্ত হোয়ে পড়্‌তে লাগ্‌ল। কিন্তু সে থাম্‌তে পারছিল না, তার মনে হোতে লাগ্‌ল যদি মেয়েটীকে সাপে কাম্‌ড়ে থাকে তা হোলে আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব করলে চল্‌বে না। হয়ত চিকিৎসার সময় উত্তীর্ণ হোয়ে গিয়েছে। তবুও যদি তার পরমায়ু থাকে—

দীপক দেখতে পেলে একখানা মোটর গাড়ী তার দিকে ছুটে আস্‌ছে। সে তাড়াতাড়ি মেয়েটীকে এক ধারে নামিয়ে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাত তুলে চীৎকার কোরে গাড়ীখানা থামিয়ে ফেল্লে। কিন্তু গাড়ীর মধ্যে যারা বসে ছিল তারা তার কথা শুনে বিরক্ত হোয়ে চালককে বল্লে—চালাও।

গাড়ীখানা চলে গেল। দীপক মেয়েটীকে আবার তুলে নিয়ে বাড়ীর দিকে পা চালিয়ে দিলে। প্রায় ঘণ্টাখানেক চলার পর অবনীদের বাড়ীর কাছাকাছি এসে সে ভাব্‌লে অবনীকে ডেকে এখনকার মতো যদি মেয়েটীকে তাদের ওখানে রাখার ব্যবস্থা করা যায় তা হোলে মন্দ হয় না।

কোনো রকমে তার শ্রান্ত পা-দুখানাকে টেনে সে অবনীদের গেটের সাম্‌নে এসে দাঁড়াল। অবনীদের দরোয়ান তখন চীৎকার কোরে তুলসীদাস পড়ে ভাঙের নেশাটাকে ঘোরালো

কোরে তুলছিল এমন সময় মুখ তুলে দেখলে দীপক কাঁধে একটি মেয়ে নিয়ে সাম্‌নে দাঁড়িয়ে। দীপক বল্লে—অবনীবাবুকে শীগ্‌গীর বলগে যাও যে আমি ডাকৃছি।

দরোয়ান অবাক হোয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল। ব্যাপারটা যে কি তা সে বুঝতেই পারছিল না। নেশার খেয়ালে সে ভাবতে লাগ্‌ল, ভোলানাথ কি এখনো সতীকে কাঁধে নিয়ে তেমনি কোরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

দীপক আবার তাড়া দিয়ে বল্লে—যাও, হাঁ কোরে দেখ্‌চ কি ?

দরোয়ান আর কোনো কথা না বলে বাড়ীর ভেতরে ছুট্‌ল। মিনিট দুয়েকের মধ্যে অবনী বেরিয়ে এসে তাকে সেই অবস্থায় দেখে জিজ্ঞাসা করলে—এ কি ব্যাপার ?

দীপক সংক্ষেপে যতটুকু বলা যায় তাই বলে বল্লে—এখন একে তোমার ঘরে রাখ, আমি ছুটে গিয়ে একটা ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসি।

অবনী বল্লে—পাগল হয়েচ! আমার ঘর কোথায়! এ সব দেখলে বাবা এখুনি বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবে।

দীপক আর কোনো কথা না বলে মেয়েটীকে তুলে নিয়ে তখুনি নিজের বাড়ীর দিকে ছুট্‌ল।

সারারাত্রি ধরে দীপক, চারু, শান্তি ও ডাক্তারে মিলে পরিচর্য্যা করবার পর সকালের দিকে মেয়েটীর জ্ঞান হোলো। তার এই অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বল্লে যে,

তারা মেটিয়াবুরুজে থাকে। সেদিন সকাল বেলা সে গঙ্গার ধারে ভিক্ষা করতে গিয়েছিল। গঙ্গার ধারে একখানা নৌকো দেখে সেখানে গিয়ে ভিক্ষে চাওয়ায় নৌকোর বাবুরা খাবার ও কাপড় দেবার লোভ দেখিয়ে তাকে নৌকোয় তুলে একেবারে কলকাতায় নিয়ে আসে। সেখান থেকে তার বাপ-মার কাছে পৌঁছে দেবে বলে তারা তাকে হাওয়ার গাড়ী চড়িয়ে একটা বাগানে নিয়ে যায়। সেখানে অনেকে মিলে তার ওপরে অত্যাচার করায় সে অজ্ঞান হোয়ে পড়ে। তার পরে কি হয়েছে তা সে জানে না।

ডাক্তার অনেকক্ষণই এই রকম একটা সন্দেহ করছিলেন। তিনি পরীক্ষা কোরে দীপককে জানালেন যে মেয়েটী তার ওপরে অত্যাচারের যে বর্ণনা করেছে তার প্রতি বর্ণ সত্য।

নাম জিজ্ঞাসা করায় সে বল্লে যে, তার নাম রূপমতী। সে আরও বল্লে যে, তার বাবা মুসলমান সেইজন্য সে তার নাম রেখেছিল আয়েষা। কিন্তু তার মা হিন্দুর মেয়ে বলে সে নাম বদলে রেখেছে রূপমতী।

ব্যাপারটা দীপকদের কাছে ক্রমেই ঘোরালো হোয়ে উঠতে লাগল। দীপক জিজ্ঞাসা করলে—মেটেবুরুজে নিয়ে গেলে তুমি তোমাদের বাড়ী চিনতে পারবে?

মেয়েটী বল্লে যে, তারা বাড়ীতে থাকে না। বাড়ী থেকে রেলে চড়ে এসে আজ ক'দিন থেকে তারা গঙ্গার ধারে বাস করচে। তাদের মতন আরও অনেকে সেখানে আছে।

দীপকদের কৌতুহল ক্রমেই বেড়ে উঠছিল। রূপমতী তাদের ওখানে আরও দু-দিন থেকে একটু সুস্থ হবার পর দীপক ও চারু তাকে নিয়ে মোটরে কোরে মেটেবুরুজে গেল। সেখানে গিয়ে তারা দেখলে যে, প্রায় পঞ্চাশ ষাটটা পরিবার বাক্স-পেঁট্‌রা হাঁড়ি-কুঁড়ি, ছেলে-পিলে নিয়ে গঙ্গার ধারে পড়ে আছে। তাদের মধ্যে খুঁজে-খুঁজে তারা রূপমতীর বাবা আল্লাবক্সকে বের করলে। তাদের স্বামী-স্ত্রীর আজ দু-দিন ধরে পেটে অন্ন নেই, চোখে নিদ্রা নেই। তার ছোট-ছোট ভাই-বোনগুলি তাদের দিদির জন্য কেঁদে-কেঁদে চোখ ফুলিয়ে ফেলেছে। আল্লাবক্সের জোয়ান বেটী হারিয়ে যাওয়ায় তাদের মধ্যে মহা উত্তেজনার সাড়া পড়ে গিয়েছে। দীপকরা রূপমতীকে নিয়ে যখন তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়াল তখন সেখানকার স্ত্রীপুরুষ কাচ্চাবাচ্চা যে যেখানে ছিল সবাই এসে তাদের ঘিরে ফেল্লে। এখানে সে অবস্থায় অতগুলি পরিবার কেন দিন কাটাচ্ছে তার ইতিহাস তারা রূপমতীর বাবার কাছ থেকে সংগ্রহ করলে। সে কাহিনী এই—

অনেকদিন আগে আল্লাবক্স যখন তার বাপ মায়ের সঙ্গে ফিজদ্বীপে যায় তখন তার বালকত্বের সীমা পেরোয়-নি। তাদের সঙ্গে তাদের গ্রামের আরও দশ বারোটী পরিবার সেখানে গিয়েছিল। ইতিপূর্ব্বে তাদের গ্রামের আরও অনেক হিন্দু মুসলমান বাড়ী-ঘর ছেড়ে সেখানে চাকরী নিয়ে চলে গিয়েছিল। তারা বাড়ীতে বসে শুনত যে, তারা সেখানে খুব সুখে আছে,

অনেক টাকা-কড়ি রোজগার কর্‌চে। অর্থের আশায় ও আড়কাটিদের মধুবাক্যে বিশ্বাস কোরে তারাও একদিন মহা উৎসাহে ফিজি যাত্রা করলে। বালক আল্লাবক্স নতুন দেশে গিয়ে নতুন সঙ্গী ও সঙ্গিনী পেয়ে আনন্দে দেশের কথা ভুলে গেল। কিন্তু সে দেখ্‌লে যে, বিদেশে যাবার কিছুদিন পরেই তার বাবা-মা আবার দেশে ফিরে যাবার জন্য উতলা হোয়ে উঠ্‌ল। দিনশেষে কর্ম্মক্লান্ত শরীর নিয়ে তারা ঘরে ফিরে প্রথমেই বল্‌ত—এর চেয়ে দেশ ঢের ভাল।

দেশের প্রতি বাবা মার প্রীতি হঠাৎ যে কেন এমন বেড়ে উঠ্‌ল এবং দিনে-দিনে তা বেড়েই চল্‌ল আল্লাবক্স তার কারণ তখ্‌ন বুঝতে পারে-নি। সে বড় হওয়ার পর তার বাবা তাকে নিয়ে গিয়ে কাজে ভর্ত্তি করিয়ে দিলে। এতদিন পরে কাজে ঢুকে সে তার বাপ-মায়ের দুঃখ বুঝতে পারলে। সেখানকার ধবল ধনিকেরা ভারতবর্ষের চেয়ে তাদের বেশী মজুরী দেয় বটে কিন্তু তারা তাদের মানুষ বলে গণ্য করে না, পশুর প্রতি যে সদয় ব্যবহার তারা করে এই কাল মজুরদের প্রতি সেটুকু সহৃদয়তাও তারা দেখায় না। স্বামীকে চোখের সাম্‌নে স্ত্রীর লাঞ্ছনা দেখতে হয়। পুত্রের সম্মুখে মাতার দেহ বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত হোয়ে ওঠে। চোখের সম্মুখে নিত্য এই পৈশাচিক লীলা দেখতে-দেখতে ক্রমে তাদের মনও কঠিন হোয়ে যায়, সম্ভব-অসম্ভব কোনো রকম অত্যাচার বা বিকার তাদের মনে আর সাড়া জাগিয়ে তোলে না। সেখানে তাদের কোনো

রকম সামাজিক বন্ধন রাখবার হুকুম নেই। তাদের আগে যারা গিয়ে সেখানে পুরুষানুক্রমে বাস করচে তাদের অবস্থা আরও শোচনীয়।

এই অত্যাচারে জর্জ্জরিত হোয়ে ধীরে-ধীরে আল্লাবক্সের পিতামাতার জীবন-প্রদীপ নিভে গেল। মরবার সময় তার বাবা তার হাত ধরে বলে গিয়েছিল—এই দোজখ্ ছেড়ে তুই তোর জন্মভূমিতে ফিরে যাস্!

আল্লবাক্স আরও বল্লে যে, সেখানে সে এক হিন্দু মেয়েকে বিয়ে করেচে। সেখানে তার মতন অনেকে আছে। হিন্দু ব্রাহ্মণের ছেলে মুসলমানের মেয়েকে বিয়ে করেচে এ রকম লোকও সেখানে দেখতে পাওয়া যায়। নিজেদের মধ্যে এ সব নিয়ে তাদের হাঙ্গামা খুব কমই হয় কিন্তু কোম্পানীর অত্যাচার! মানুষের মন নিয়ে সে অত্যাচার সহ্য করা অসাধ্য। এই ঘৃণ্য জীবন সহ্য করতে না পেরে তারা পঞ্চাশ-ষাটটি পরিবার সেখানকার জমি বাড়ী সব ছেড়ে দিয়ে একদিন জাহাজে চড়ে হিন্দুস্থানের দিকে পাড়ি দিলে।

কিন্তু দেশে এসে তারা কি দেখ্‌লে! বিদেশে বিজাতির অত্যাচারে তাদের জর্জ্জরিত মন যেখানকার কল্পনায় শান্তি পেত। শাসন-জর্জ্জরিত জরতপ্তদেহে বিছানায় শুয়ে শিশুকাল থেকে পুরুষানুক্রমে যে শান্তিনীড়ের কল্পনা তাদের মনে এতদিন কত সুখ-স্বপ্ন জাগিয়ে তুলেচে—সেখানে তাদের জন্য কি অপেক্ষা কর্‌ছিল? তারা দেশে ফিরে দেখ্‌লে যে, দেশে তাদের স্থান

নেই। যে গৃহে তাদের বাল্যকাল কেটেচে, বহুকাল অনুপস্থিতির সুযোগ পেয়ে আত্মীয়েরা সে ঘর দখল কোরে বসে আছে। আল্লাবক্স অনেক চেষ্টা কোরেও তার পৈত্রিক ভিটে ফিরিয়ে পায়-নি। হিন্দুদের অবস্থা আরও শোচনীয়। একে কালাপানি পার হওয়া তার ওপরে মুসলমানদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করা এতদিন সর্ব্ববিষয়ে তারা তাদের দেশাচারের বিরোধিতা কোরে যে পাপ করেছে তার জন্য তারা যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় কোরে প্রায়শ্চিত্ত কোরেও সমাজে জাতভাইদের সঙ্গে সমান হোতে পারলে না। তাদের পয়সা-কড়ি যা ছিল তারা সব ভোগা দিয়ে নিয়ে তবুও তাদের একঘরে কোরে রেখে দিলে। হিন্দুরা তাদের সঙ্গে খায় না, হিন্দুরা যে কূয়ো থেকে জল নেয় সেখানে তাদের মেয়েরা জল আনতে গেলে বেইজ্জত হয়। তারা পাশ দিয়ে গেলে সকলে ঘৃণায় সরে যায়। সমাজে এরা একঘরে হোয়ে রইল বটে কিন্তু তাদের ঘরের যুবতী মেয়েরা দেশের ভদ্রলোকদের বিলাসের উপকরণ হোয়ে দাঁড়াল। তাদের ঘরের মেয়েদের জোর কোরে টেনে নিয়ে গেলে কেউ একটা সহানুভূতিও জানায় না। বিদেশী ও বিধর্ম্মীদের হাতে এতদিন ধরে নির্জ্জিত হোয়েও তাদের মন এতখানি সহ্য করবার মতো ঘাতসহ হোয়ে ওঠে-নি। তাই এতদিন ধরে তারা যাকে স্বর্গাদপি গরীয়সী বলে মনে কোরে এসেছে সেই স্বর্গবাসী জীবদের ব্যবহারে ক্ষোভে, অভিমানে আবার তারা নরকে ফিরে চলেচে।

দীপক খোঁজ নিয়ে আরও জানতে পারলে যে, তারা এখানে জাহাজের জন্য অপেক্ষা কর্‌চে। কিন্তু এখানেও তাদের ওপরে পুলিশের উৎপীড়ন তো আছেই তা ছাড়া রাত্রে এই সর্ব্বহারাদের ভাঙা বাসনপত্রও চোরে চুরি কোরে নিয়ে যাচ্ছে, মেয়েরা ভিক্ষা করতে গিয়ে সর্ব্বস্ব দিয়ে ফিরে আস্‌চে।

আল্লাবক্সের করুণ ইতিহাস দীপককে বিচলিত কোরে তুল্লে। হঠাৎ যেন তার সম্মুখে তার চিরবাঞ্ছিত কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারিত হোয়ে গেল। সে সবাইকে এক জায়গায় জড়ো কোরে নিয়ে বল্লে—বন্ধুগণ, তোমরা তোমাদের স্বজাতি ও স্বজনদের দ্বারা প্রতারিত ও নির্জ্জিত হয়েচ বলে দেশবাসী সকলের প্রতি অবিচার কোরো না। তোমাদের জন্য আমি স্থান কোরে রেখেচি। এতদিন কায়মনবাক্যে আমি তোমাদেরই প্রতীক্ষা করছিলুম, আজ ঈশ্বর অপ্রত্যাশিতভাবে তোমাদের মিলিয়ে দিয়েছেন।

দীপক তাদের কাছে তার উপনিবেশের সমস্ত বিবরণ খুলে বল্লে। তাদের মধ্যে দু-চারজন মুরুব্বী তখুনি দীপকের সঙ্গে তার উপনিবেশ দেখতে গেল। সেখানকার ব্যবস্থা দেখে খুশী হোয়ে ফিরে এসে তারা দলবল নিয়ে সেইদিনই সেখানে গিয়ে আস্তানা কর্‌লে।

সেদিন রাত্রে অবনীদের বাড়ী থেকে অমন কোরে চলে আসবার পর আরও মাসখানেক দীপক তাদের বাড়ীতে যেতে পারলে না। সে রোজই মনে করত সেখানে যাবে কিন্তু তার উপনিবেশে লোক আসতে আরম্ভ করায় কিছুদিন থেকে কাজ এত বেড়ে গিয়েছিল যে সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি সে নিঃশ্বাস ফেলবার সময় পাচ্ছিল না। এমন সময় একদিন দীপক সংবাদ পেলে যে কোন্ এক অপিসে অবনীর চাকরী হয়েছে। প্রত্যহ বেলা দশটার সময় সে কোট প্যাণ্টলুন পরে চাকরী করতে বেরুচ্ছে।

সেদিন ছিল রবিবার। দীপক প্রত্যহ সকাল বেলা উপনিবেশে যেত কিন্তু সেদিন অবনীর ছুটি আছে জেনে সে উপনিবেশে না গিয়ে অবনীর সঙ্গে দেখা করতে গেল। দীপককে দেখে অবনী এসে তাকে আলিঙ্গন দিয়ে তার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালে। বারো বছর পরে সেদিন রাত্রে কয়েক মিনিটের জন্য তাদের একবার দেখা হয়েছিল কিন্তু তখন তাদের কথাবার্ত্তা হবার কোনো সুযোগই হয়-নি। অবনী জিজ্ঞাসা করলে—সে মেয়েটী কে?

দীপক রূপমতীর কাহিনী তাকে সমস্ত খুলে বল্লে। অবনী সে কাহিনী শুনে চুপ কোরে বসে রইল। দীপক তাকে তাদের উপনিবেশের কথা বলে বল্লে—তোমার আশায় আমি এতদিন বসেছিলুম, এবার তুমি এসেছ আর আমার মনে হচ্ছে যেন আমার শক্তি দশ গুণ বেড়ে গিয়েছে। চল আজ আমাদের উপনিবেশ দেখ্‌বে চল।

দীপকের কথা শুনে অবনী একটু ম্লান হাসি হেসে সাম্‌নের খোলা জানালার দিকে চেয়ে রইল। তার মন যেন তার দৃষ্টিটাকে নিয়ে মুক্তপক্ষে উধাও হোয়ে আকাশের নীল মেঘের রাজ্যে চলে গেল দীপক হাঁ কোরে অবনীর মুখের দিকে চেয়ে রইল। অবনীর যারা আন্তরিক বন্ধু তারা তার এই দৃষ্টির অর্থ বুঝতে পার্‌ত। যখনি সে কোনো চিন্তা কর্‌ত তখনি সেই চিন্তার গভীরতার ছাপ তার চোখের মধ্যে আশ্চর্য্যভাবে ফুটে উঠ্‌ত। খানিকক্ষণ এইভাবে চেয়ে থেকে অবনী বল্লে—আমার আর কাজ করবার কোনো শক্তি নাই। আমাকে মুক্তি দেবার সময় প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেওয়া হয়েছে যে, ভবিষ্যতে রাজনীতিক দলে জড়িত থাক্‌তে পার্‌ব না। বাড়ীতে ঢোকবার সময় বাবা প্রতিজ্ঞা করিয়েছেন যে, কি রাজনীতি কি সামাজিক কোনো দলেই আমার ঢোকা চল্‌বে না। সে রকম কাজে যোগ দেবার আগে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। পাছে আমি কোনো রকম কাজে লিপ্ত হোয়ে পড়ি এই ভয়ে বাড়ী ফিরতে না ফিরতে আমাকে একটা কাজের চেষ্টা করবার জন্য শিমলায় পাঠিয়ে

দিয়েছিলেন। সেখান থেকে চাকরী নিয়ে ফিরে এসেছি। এখন আমি সকাল দশটায় আফিসে বেরুই আর ছটায় সময় ফিরি।

এই অবধি বলে অবনী চুপ করলে। দীপক কি বল্‌বে তা বুঝতে না পেরে চুপ কোরে রইল। একটু পরে নিস্তব্ধতা ভেঙে অবনী উৎসাহের সঙ্গে তাড়াতাড়ি বলে উঠ্‌ল—আফিসে আমার খুব নাম হয়েছে, ভবিষ্যতে উন্নতি হবার আশাও আছে। বাবা বলেন যে, ভাল কোরে কাজ করলে তারা আমায় অংশীদার পর্য্যন্ত কোরে নিতে পারে—

এই অবধি বলে অবনী চেঁচিয়ে হো হো কোরে হেসে উঠ্‌লে। তার সেই হাসির আওয়াজে দীপক চম্‌কে উঠ্‌ল। সে অবাক হোয়ে অবনীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কাজ কেমন লাগ্‌ছে?

অবনী বল্লে—কাজ! দীপান্তরে জেলের মধ্যেও তো কাজ করেছি কিন্তু তখনো এতখানি অসহায় ও এতখানি পরাধীন মনে হয়নি।

দীপক বল্লে—তা হোলে কাজ ছেড়ে দাও না।

অবনী বল্লে—কি করব?

দীপক বল্লে—করবার ঢের কাজ আছে।

—চাকরী তো?

—না চাকরী কেন! তুমি আমাদের উপনিবেশের একটা কাজ নাও।

—সেইটেই পরে চাকরীতে দাঁড়িয়ে যাবে। আর অন্য কিছু করলে এখানে থাকা চল্‌বে না। আবার এ বয়সে দু-মুঠো অন্নের জন্য লোকের খোসামোদ কোরে বেড়ানোর চেয়ে বাপেরই খোসামোদ করি না। বন্ধু-বান্ধবদের অবস্থা তো দেখ্‌চি। নেহাৎ যেদিন অসহ্য হবে সেদিন এই আছে—

অবনী টেবিলের টানাটা খুলে একটা রিভলভার বার করলে।

দীপক জিজ্ঞাসা করলে—ছবি-টবি আঁক্‌ছ ?

অবনী উঠে গিয়ে একখানা অসমাপ্ত ছবি এনে দীপকের হাতে দিয়ে বল্লে—শিমলে থাকতে মাঝে-মাঝে ছবি আঁকতুম।

দীপক ছবিখানা দেখতে লাগ্‌ল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধক্ষেত্রের মুখে অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ দিচ্ছেন। ছবিটা সম্পূর্ণ আঁকা হয়নি কিন্তু দীপক বুঝতে পারলে যে এ ছবি শেষ হোলে এতদিন পরে আবার অবনী চৌধুরীর প্রশংসায় গুণীসমাজ মুখরিত হোয়ে উঠ্‌বে। বন্ধুর সেই ভাবী সৌভাগ্যের কথা মনে কোরে দীপকের মনটা খুশী হোয়ে উঠ্‌ল। সে অবনীকে বল্লে—তাড়াতাড়ি ছবিখানা শেষ কোরে ফেল।

অবনী হেসে বল্লে—আমার হাত্‌পায়ের নিগড় যে কত কঠিন আর কত ভারী তা এই ছবি আঁকতে যখন বসি তখন ভালো কোরে বুঝতে পারি। দেখ, দেশলক্ষ্মীর অঙ্গে জোর কোরে শৃঙ্খল চাপিয়ে দিলেও তার মৃত্যু হোতে সময় লাগে কিন্তু কলালক্ষ্মী পরাধীনতার সামান্য চাপও সহ্য করতে পারেন না।

এই কলালক্ষ্মী আমায় ছেড়ে চলেছেন—আমি বুঝতে পারছি—তার সঙ্গে তিল-তিল কোরে আমার মৃত্যু হচ্ছে।

দীপক সেদিন অনেকক্ষণ বসে অবনীকে উৎসাহ দিলে। অবনী বল্লে—তুমি মাঝে-মাঝে এস। অবিশ্যি তোমাদের আসা-টাসা বাবা খুব সুনজরে দেখেন না, তবুও অন্ততঃ তোমাকে আমার জন্য সেটুকু সহ্য করতে হবে।

দীপক বল্লে—সে কথা আমি জানি। হাজত থেকে ফিরে আসবার পর মাসীমাও আমায় ঐ কথাই বলেছিলেন। তোমার বাবা অসন্তুষ্ট হচ্ছেন জেনেও তখন আমি রোজ আসতুম।

অবনী রুদ্ধকণ্ঠে বল্লে—মা মারা গেছেন—বেঁচে গেছেন।

দীপক জিজ্ঞাসা করলে—স্বাতী কোথায়?

অবনী বল্লে—স্বাতী মীরাটে আছে। তার একটি ছেলে ও একটি মেয়ে। আমি আসা-মাত্র সে আমাকে তার কাছে ডেকেছিল কিন্তু বাবা যেতে দিলেন না।

—তার কারণ?

—তার কারণ স্বাতীর স্বামী সরকারী বড় চাকুরে। আমি গিয়ে সেখানে উপস্থিত হোলে যদি চাকুরী যায়। যে কারণে আমার ওপরে এই অত্যাচার চলেছে—।

দীপক সেদিনকার মতো বিদায় নিয়ে অবনীর কাছ থেকে চলে এল। কিন্তু বাড়ীতে কিংবা বাড়ীর বাইরে খেতে-শুতে সে স্বস্তি পাচ্ছিল না। কিসের একটা গুরুভার তার মনের মধ্যে চেপে রইল কিছুতেই সেটাকে সে সরিয়ে ফেলতে পারছিল না।

সে ভেবে পাচ্ছিল না, যে লোক প্রাণের ভয় করে না সে লোক বাপের ভয়ে এমন হোয়ে থাকে কি কোরে? দীপকের মনে হোতে লাগ্‌ল হয়ত দ্বীপান্তর-বাসের ফলে তার অন্য বন্ধুদের মতন তারও মনের উৎসাহের উৎস শুকিয়ে গিয়েছে। সে সময় পেলেই অবনীর কাছে গিয়ে তার মনকে চাঙ্গা কোরে তোলবার চেষ্টা করতে লাগ্‌ল।

* * * *

মেটেবুরুজ থেকে আল্লাবক্স ও তার বন্ধুরা দীপকের উপনিবেশে এসে বাস করতে আরম্ভ করা-মাত্রই সেখানে অন্য লোকও আসতে আরম্ভ কোরে দিলে। আল্লাবক্স ও তার সঙ্গীদের বাড়ী ছিল ত্রিহুতে। তারা সকলেই মিলে-মিশে বাস করছিল কিন্তু সেখানে বাঙালী প্রজা বসাবার পরই তাদের সঙ্গে এদের ঠোকাঠুকি বাধতে লাগ্‌ল। দীপকরা পরামর্শ কোরে বাঙালী ও ত্রিহুতীদের দুটো আলাদা পাড়া ঠিক কোরে দিলে। উপনিবেশ ভালোই চলতে লাগ্‌ল।

উপনিবেশের কাজ বেশ ভালো ভাবে চলবার পরই দীপক উপনিবেশের মধ্যেই একটি স্কুল খোলবার প্রস্তাব করলে। সে ঠিক করলে যে, স্কুলের সমস্ত ভার চারুর ওপরে দেবে। চারু ধীর, শান্ত ও মিষ্টভাষী, তা ছাড়া লেখাপড়াও সে বেশ জানে। সকলে চারুকেই তাদের শিক্ষা-বিভাগের পূরো ভার দেবার প্রস্তাব অনুমোদন করলে।

দীপক একদিন চারুকে জিজ্ঞাসা করলে—আমাদের যে স্কুল হচ্ছে তার ভার তুমি নিতে পারবে ?

চারু বল্লে—হ্যাঁ, নিশ্চয় পারব।

দীপক বল্লে—অত তাড়াতাড়ি জবাব দিও না। পারা মানে বুঝতে পেরেচ তো ? তোমাকে সেই সকাল থেকে আরম্ভ কোরে সন্ধ্যা অবধি ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার কাজে ব্যস্ত থাকতে হবে। এর জন্য আমরা তোমায় কিছুই দিতে পারব না। অন্ততঃ উপনিবেশ থেকে যত দিন খাজনা আদায় না হয় ততদিন তো কিছুই পাবে না। তার পরেও বা যদি কিছু পাও সেও অতি সামান্য। চিরজীবনের জন্য একটা ব্রত নেবার আগে তুমি এর পূর্ব্বাপর ভালো কোরে চিন্তা কোরে দেখো। তোমার বাড়ীর লোকেরা হয়ত আশা কোরে আছেন তুমি চাকরী নিয়ে সাংসারিক উন্নতি করবে। একবার তাঁদেরও জানানো প্রয়োজন।

চারু বল্লে—আমার বাবা আমার জন্য যা রেখে গিয়েছেন আমার পক্ষে তা যথেষ্টরও বেশী। সংসারে একমাত্র মা ছাড়া আমার আর কেউ নেই। আমি তাঁকে ভালো কোরে জানি। দেশের সেবা করতে যদি আমায় সত্যিকারের দারিদ্র্য-ব্রত গ্রহণ করতে হোতো তা হোলেও তিনি আপত্তি করতেন না।

দীপক বল্লে—তবুও কাজে লেগে পড়বার আগে তুমি আর একবার তাঁর সঙ্গে পরামর্শ কর। এতে তিনিও খুশী হবেন আর তাঁর আশীর্ব্বাদ নিয়ে কাজে নামলে সকল কাজে সাফল্যও লাভ করতে পারবে।

চারু বল্লে—আচ্ছা বেশ। আপনি যখন বলছেন তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করব।

সেদিন ওঠবার সময় চারু বল্লে—দীপদা আপনাকে একটা কথা বল্‌ব—

দীপক বল্লে—কি বল?

চারু কিছু না বলে ঘাড় হেঁট কোরে রইল। দীপক আবার বল্লে—কি বল্‌বে বল?

চারু এবার ঘাড় তুলে লজ্জায় লাল হোয়ে বল্লে—আমি অনুকে বিয়ে করতে চাই।

দীপক একটু চুপ কোরে থেকে বল্লে—অনুর এ বিষয়ে মতামত কি তা জেনেচ?

চারু বল্লে—আমি যতটা জানি অনুর এতে অমত নেই।

দীপক বল্লে—তোমার হাতে অনুকে দিতে আমার কোনো অমত নেই। কিন্তু বাড়ীর সবারও মতামত জানা দরকার। সবার আগে অনুর মত হওয়া চাই—কি বল?

চারু বল্লে—নিশ্চয়। আচ্ছা আপনি এ বিষয়ে এখন কারুকে কিছু বল্‌বেন না। আমি কয়েকদিন বাদে আপনাকে জানাব।

দীপক বল্লে—বেশ!

উপনিবেশে স্কুলের জন্য আবার একটি বড় গোছের আটচালা উঠতে লাগ্‌ল। দীপক শান্তিকে বল্লে—বৌদি আমাদের স্কুলের নাম হচ্ছে—শান্তি-আশ্রম।

শান্তি বল্লে—বেশ হয়েছে।

দীপক বল্লে—কেন ঐ নাম রাখা হোলো জান ?

শান্তি বল্লে—না কেন ?

—তোমার নামে স্কুলের নাম রাখা হোলো।

শান্তি বল্লে—ওমা তাই নাকি ! আমি তা বুঝতে পারি-নি। কেন আমার নামে ইস্কুল কেন ? নাম যদি দিতেই হয় তা হোলে কোনো বড় লোকের নামে নাম দাও।

দীপক হেসে বল্লে—বৌদি তুমি জান না যে তুমি একজন বড়লোক। তোমার মধ্যে যে বড়ত্ব সেটা আবিস্কার করেছি আমি। তোমার বড়ত্বটা প্রকাশ হবে আমার মধ্যে দিয়ে।

শান্তি কোনো কথা বল্লে না, কিন্তু দীপকের এই কথাগুলো শুনে আনন্দে তার চোখ দুটো জল্‌জল্ কোরে উঠ্‌ল। দীপক আবার বল্‌তে লাগ্‌ল—বারো বছর আগে তোমাতে আমাতে বসেই এই স্কুলের কল্পনা করেছিলুম। তোমার সেই উৎসাহ আমার মধ্যে জমা হোয়ে রয়েছে।

শান্তি এবার বল্লে—স্কুলের এই নাম হবে শুনে উপনিবেশের অন্য সেবকেরা কি বল্লে ?

দীপক বল্লে—তারা শুধু নামের দিক দিয়েই এটার বিচার করেছে। নামের পিছনে যে ব্যক্তি রয়েছে তার কথা জান্‌লো শুধু তুমি আর আমি।

স্কুলের কথা শেষ কোরে দীপক বল্লে—চারু যে অনুকে বিয়ে করতে চায়।

—কে বল্লে ?

—চারু নিজে।

শান্তি একটু ভেবে জিজ্ঞাসা করলে—তুমি কি বল্লে ?

দীপক বল্লে—আমি তাকে বলেছি এ বিষয়ে অনুর মতামত সকলের আগে জানা দরকার। তার পরে মা আছেন, তুমি আছ। অবিশ্যি আমি বলে দিয়েছি যে, আমার কোনো আপত্তি নেই।

শান্তি বল্লে—আমারও কোনো আপত্তি নেই। চারু বেশ ভালো ছেলে। কিন্তু—

দীপক জিজ্ঞাসা করলে—আবার কিন্তু কি ? মার আপত্তি আছে নাকি ! তবে যে তুমি বলেছিলে—

শান্তি বল্লে—হ্যাঁ, ওদের দু'জনের হালচাল দেখে তখন আমার মনে হয়েছিল বটে, কিন্তু কিছুদিন থেকে দেখ্‌ছি যে অনু আর চারুকে তেমন আমল দিচ্ছে না। আজকাল আবার যতীন সরকার ওর দিকে ভারি ঝুঁকেছে দেখ্‌ছি। অনুও যতীনকে খুব অপছন্দ করে বলে মনে হয় না।

যতীন্দ্রনাথ সরকার ওরফে যতে সরকার দীপকদের অঞ্চলের একজন নামজাদা ছেলে। তার বাপ রেঙ্গুণে কাঠের ব্যবসা কোরে বিস্তর পয়সা করেছিলেন। যতীন স্কুলেই লেখাপড়ায় ইস্তফা দিয়েছিল। তবে খেলাধূলায় ছিল ওস্তাদ। সে দেখ্‌তে সুন্দর এবং শরীরের চর্চ্চাও করত। যতীনকে এমনি অপছন্দ না করলেও তার সঙ্গে অনুর বিবাহের কল্পনাও দীপকের মাথায়

কখনো ঢোকেনি। যতীনের টাকার দেমাক ছিল অত্যন্ত বেশী। এই জিনিষটী দীপক কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারত না। তা ছাড়া যতীনের বাবা যে ব্রাহ্মের মেয়ের সঙ্গে তাঁর ছেলের বিবাহ দিতে রাজী হবেন কিনা সে বিষয়ে তাঁর ঘোরতর সন্দেহ ছিল। তা ছাড়া যতীনের চাল-চলনের কথাবার্ত্তার মধ্যে শিক্ষা-হীনতার এমন একটা ছাপ স্পষ্ট ফুটে উঠ্‌ত যে, বেঙ্গল ব্যাঙ্কের জমা লাখ্ টাকার কোম্পানীর কাগজও তা চেপে রাখ্‌তে পারত না। চারুকে ছেড়ে অনু এই যতীনের প্রতি অনুরাগিনী হয়েছে শুনে দীপক দুঃখিত হোলো। সে শান্তিকে বল্লে—শেষকালে অনু ঐ যতীনটাকে পছন্দ করলে—

শান্তি বল্লে—কেন যতীন তো বেশ ছেলে। তবে একটু যা বোকা—

দীপক রহস্য কোরে বল্লে—বোকা স্বামী নিয়ে ঘর করা সহজ—না বৌদি!

দীপকের রহস্যে শান্তির মুখ লাল হোয়ে উঠ্‌ল—সে বল্লে—আমি জানি না—যাও।

দীপক একটু চুপ কোরে থেকে বল্লে—তুমি আমায় ভাবনায় ফেল্লে বৌদি।

—কেন?

অনুর জন্য আমার ভাবনা হচ্ছে।

শান্তি বল্লে—ভাবনার কি আছে। যতীন যদি অনুকে বিয়ে করতে চায় আর অনুর যদি তাতে অমত না থাকে তবে

চারু হাত এক জোরে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। কতদিন আর খুবড়ো হোয়ে থাকবে বল।

শান্তির অনুমান ভুল হয়নি। দীপক কয়েকদিন ধরে লক্ষ্য করলে যে অনু যতীনের প্রতিই অনুরাগিনী। চারু তখনো তাদের বাড়ীতে আসা যাওয়া করছিল বটে, কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই সে সেখানে যাওয়া আসা কমিয়ে ফেল্লে। একদিন শান্তি সবার সাম্‌নেই চারুকে জেরা করলে—কি চারু, আর যে বড় টেনিসে তোমায় দেখ্‌তে পাইনে।

চারু বল্লে—কি কর্‌ব বৌদি, দীপদা কাঁধে যা ভার চাপিয়েছেন সন্ধ্যের আগে আর ছুটিই পাইঁ না।

চারু দীপককে অনুর মতামত জানাবে শীগ্‌গীর বলেছি কিন্তু মাসখানেক হোয়ে গেল তবুও সে দীপককে কোনো কথা বল্লে না। এদিকে দীপক দেখ্‌লে যে অনু যতীনকে নিয়ে ক্রমেই মেতে উঠ্‌ছে। তাদের বাড়ীতে নেমতন্ন, পিকনিক্ ইত্যাদি লেগেই আছে। ক্রমে তাদের বাড়ীতে আড্ডাটি যতীনদের বাড়ীতেই একরকম বস্‌তে আরম্ভ হোলো।

দীপক শান্তিকে জিজ্ঞাসা করলে—যতীন যদি অনুকে বিয়ে কর্‌তে চায় তা হোলে খুলে বলুক না। ওরা যে রকম বাড়াবাড়ি কর্‌ছে সেটা আবার শোভনও নয় সঙ্গতও নয়। আমি মনে কর্‌ছি এতদিন যতীনকে বল্‌ব।

শান্তি বল্লে—যতীন বোধ হয় অনুর মন বুঝতে পারছে না।

দীপক বল্লে—বুঝতে পার্‌ছে না কি রকম?

শান্তি বল্লে—অনু যে রকম মেয়ে ও নিজের মনই বুঝতে পারে না।

দীপক বল্লে—ও সব ছেলেমানুষী করলে তো চল্‌বে না, তুমি অনুকে বুঝিয়ে বল্‌বে। তুমি যদি না পারতো আমিই বলি।

শান্তি বল্লে—আচ্ছা আমিই বল্‌ব।

—০—

বিকেল বেলা বাড়ীতে ফের্‌বার আগে দীপক উপনিবেশের আপিসে বসে সেখানকার অধিবাসীদের অভিযোগ ইত্যাদি শুন্‌ত। একদিন বিকেলে জনকয়েক হিন্দু প্রজা এসে তাকে জানালে—ধর্ম্মাবতার, হারাণ দাসের ছেলে নফর মুসলমানদের ঘরে গিয়ে কুঁক্‌ড়ো খেয়েছে।

দীপক বল্লে—তা আমি কি কর্‌ব ?

তারা বল্লে—হুজুর, ছেলেটা ভারি বেয়াড়া। আমরা তো দূরের কথা সে তার বাপমায়ের কথা শোনে না। আপনি যদি তাকে একটু শাসন কোরে দেন।

দীপক বল্লে—বেশ কিন্তু তার বিরুদ্ধে তোমাদের অভিযোগ কি সেটা তো আমার জানা দরকার।

—আজ্ঞে ঐ মুরগী-টুরগীগুলো খাওয়া—আমাদের শাস্ত্রে যখন মানা আছে।

নফর দীপকের আপিসে কাজকর্ম্ম কর্‌ত। সেদিন কাজ

কমে আসার পর দীপক তাকে জিজ্ঞাসা করলে, হ্যারে নফর তুই নাকি মুসলমানদের ঘরে গিয়ে মুরগী খাস্ ?

দীপকের প্রশ্ন শুনে নফরের মুখ শুকিয়ে উঠল—সে বল্লে, আজ্ঞে না হুজুর! এমন কথা কে বল্লে ?

নফর অস্বীকার করলেও দীপক স্পষ্ট বুঝতে পারলে যে তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ সত্য। সে বল্লে—দেখ্, বাপমার যাতে মনে কষ্ট হয় এমন কাজ করিস্-নি।

নফর মাথা হেঁট কোরে বল্লে—আর করব না হুজুর!

কয়েকদিন বাদে অছিমুদ্দিন এসে দীপককে বল্লে—হুজুর, একটা নালিশ আছে।

দীপক জিজ্ঞাসা করলে—কি নালিশ অছিমুদ্দিন ?

অছিমুদ্দিন বল্লে—হুজুরের রাজত্বে আমাদের কোনো অভাব নেই কিন্তু মেয়েছেলেদের বেইজ্জতি তো সইতে পারব না হুজুর।

দীপকের কাছে সেদিন উপনিবেশের আরও দু-একজন সেবক বসে ছিল। তারা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে আরম্ভ করলে। দীপক বল্লে—অছিমুদ্দিন স্পষ্ট কোরে খুলে বল কি হয়েছে। কে কাকে বেইজ্জত করলে ?

অছিমুদ্দিন বল্লে—জানেন তো হুজুর আমার বেটী ফতিমার এখনো বিয়ে দিতে পারিনি। এই সনের ফসলটা তুলতে পারলেই তার বিয়ে দেব। জোয়ান বেটী জল আনতে যায় আর ঐ হরিশ মণ্ডলের পোলা সনাতনটা তার সঙ্গে মস্করা করে।

ফতিমা দু-তিনদিন কিছু বলে-নি কাল নাকি ভারি একটা কথা বলায় সে আর সহ্য করতে না পেরে তার মাকে সব কথা কথা খুলে বলেছে।

চেলারা বল্লে—দীপদা, ব্যাটাকেই ধরে এনে বেশ কোরে উত্তমমধ্যম দেওয়া যাক্। কি বলেন?

দীপক বল্লে—আচ্ছা, একজন গিয়ে সনাতনকে ডেকে নিয়ে এস।

সনাতন কাঁপতে কাঁপতে এসে দাঁড়াল। দীপক তাকে জিজ্ঞাসা করলে—অছিমুদ্দিনের মেয়ে ফতিমা যখন জল আনতে যায়, তুই তাকে তখন ঠাট্টা করিস্?

সনাতন কিছু বল্লে না, চুপ কোরে ঘাড় হেঁট কোরে দাড়িয়ে রইল।

দীপক আবার জিজ্ঞাসা করলে—ফতিমাকে তোর ভালো লাগে?

সনাতন এবারও কোনো কথা বল্লে না; দীপক আবার বল্লে—এবার যদি ফতিমা কোনো দিন তোর নামে নালিশ করে তা হোলে তোকে মুসলমান হোয়ে ফতিমাকে বিয়ে করতে হবে জেনে রাখ্। এর জন্য যদি খুন-খারাপী হয় তাও হবে কেউ তোকে বাঁচাতে পারবে না।

সেদিন থেকে উপনিবেশে নালিশ পত্র কমে গেল। দীপকদের স্কুলে আটচালা তৈরি হোয়ে গেল। তারা মহাধুমধাম কোরে শান্তি-আশ্রমের উদ্বোধন উৎসব করবার আয়োজন

কর্‌ছে এমন সময় হটাৎ চারু উপনিবেশে আসা বন্ধ কোরে দিলে। অসুখ হয়েছে মনে কোরে দীপকরা চার পাঁচ দিন তার কোনো খোঁজ নিলে না। তারপরে দীপক নিজে একদিন তার বাড়ীতে গেল, কিন্তু চাকর বলে দিলে—চারুবাবু বাড়ীতে নেই।

দীপক চারুর জন্য ব্যস্ত হোয়ে উঠ্‌ল। সে উপনিবেশের সেবকদের মধ্যে দু-একজনকে চারুর বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলে, কিন্তু তারাও তার দেখা না পেয়ে ফিরে এল। এদিকে উদ্বোধন উৎসবের দিনও এগিয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল। স্কুলের সমস্ত ভার ছিল চারুর ওপরে, তার অনুপস্থিতে এই উৎসব সম্পন্ন কর্‌তে কিছুতেই দীপকের মন চাইছিল না। কিছুতেই চারুকে ধর্‌তে না পেরে শেষকালে সে তাকে চিঠি লিখ্‌লে। কয়েক দিন বাদে চারু দীপককে চিঠি লিখে জানালে—

দীপদা,

কিছু দিন আগে আমি আপনার কাছে অনুকে বিয়ে কর্‌বার অনুমতি চেয়েছিলুম। আপনি আমায় বলেছিলেন যে, এ বিষয়ে অনুর সম্মতির প্রয়োজন সকলের আগে। আমাকে বিয়ে কর্‌তে অনু রাজী আছে কিনা একথা তার কাছ থেকে জেনে আপনাকে জানাব বলেছিলুম। আপনাকে সে সময় এ কথা বল্লেও আমি মনে মনে নিশ্চয় জান্‌তুম যে আমাকে বিয়ে কর্‌তে অনুর কোনই আপত্তি হবে না। কারণ আমি জানতুম যে অনুও আমাকে ভালবাসে। এ পরিচয় অনেকবার অনেক

রকমে আমি পেয়েছি। কিন্তু লজ্জায় আমি কথাটা আপনাকে সেদিন বল্‌তে পারেনি।

কিন্তু কিছু দিন থেকে আমি লক্ষ্য কর্‌ছি যে, আমার প্রতি অনুর আর সে ভাব নেই। অবিশ্যি এ বিষয়ে আমি তাকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিনি, কারণ জিজ্ঞাসা কর্‌বার কোনো দরকারই নেই। সে যাকে বিয়ে কর্‌তে চায় তাকেই বিয়ে করুক, আমি মাঝে পড়ে তার কোনো অশান্তির কারণ হোতে চাই না। আমি অনুকে এখনো ভালোবাসি। তার ভালোবাসাই আমাকে সমস্ত কাজে উৎসাহিত করেছিল, তাকে পাব না জেনে আমার সমস্ত শক্তি পঙ্গু হয়ে গেছে। মনের এই অবস্থা নিয়ে আমি আপনাদের কোনো কাজে যোগ দিতে পার্‌ছি না বলে আমায় ক্ষমা কর্‌বেন। আমাকে আপনি একটু সহানুভূতির সঙ্গে বিচার কর্‌বেন। আমি আমার এই দুর্ব্বলতার বিরুদ্ধে নিজের সঙ্গে অহরহ যুদ্ধ কর্‌ছি, এই দুর্ব্বলতা যদি কাটিয়ে উঠতে পারি তা হোলে সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে আপনার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়্‌ব। আর তা যদি না পারি তা হোলে মনে কর্‌বেন যে আমার মৃত্যু হয়েছে। ইতি—চারু।

দীপক চারুর চিঠি পড়ে দুঃখিত হোলো, কিন্তু এ বিষয়ে করবার কিছুই নেই। সে তখনকার মতন উদ্বোধন উৎসবটা স্থগিত রেখে স্কুলের কাজ আরম্ভ কোরে দিলে।

* * * *

দীপকদের নিয়ম ছিল প্রত্যহ দু'জন সেবক রাত্রে উপনিবেশে

থাক্‌বে। এ ছাড়া তিন চারটি মফঃস্বলের ছেলে সেইখানেই থেকে চাষের কাজ শেখাবে। এক দিন রাত্রি প্রায় বারোটার সময় এদের মধ্যে একজন দীপককে এসে বল্লে—অছিমুদ্দিনের মাথায় কে লাঠি মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। দীপক তখুনি তার সঙ্গে গিয়ে দেখ্‌লে যে, অছিমুদ্দিনকে উপনিবেশের হাসপাতালে রাখা হয়েছে। তার মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, তখনো তার জ্ঞান হয়নি। ডাক্তার বল্লে—চোট্‌টা খুব সাংঘাতিক রকমের হোয়েছ, খুলি ফেটে গিয়েছে বলে সন্দেহ হচ্ছে। কি হবে বলা যায় না।

সকাল বেলায় অছিমুদ্দিনের জ্ঞান হোলো কিন্তু সেদিন সমস্তক্ষণ সে আচ্ছন্নের মতো পড়ে রইল, কোনো কথা বল্‌তে পার্‌লে না। পরের দিন ডাক্তার আবার পরীক্ষা কোরে দেখে বল্লেন, খুলি ফাটেনি কিন্তু আঘাতটা খুব সাংঘাতিক রকমের হয়েছে।

দু-তিন দিন একভাবে পড়ে থাকার পর অছিমুদ্দিন একটু সুস্থ হোতেই দীপক তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—তোমার মাথায় কে লাঠি মার্‌লে ?

অছিমুদ্দিন বল্লে—তা তো জানিনে হুজুর। মাঠ থেকে ফিরে আস্‌তে রাত হোয়ে গেল। অন্ধকারে আস্‌ছি ঐ কুয়োতলায় পেছন থেকে কে চোট্‌ লাগালে। এক চোটেই বেহুঁশ হোয়ে পড়লুম—

দীপক তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—তোমার সন্দেহ হয় কারুকে ?

অছিমুদ্দিন বল্লে—ধর্ম্মাবতার, কার নামে বল্‌ব, কারুর সঙ্গেই তো আমার শত্রুতা নেই।

অছিমুদ্দিনকে কে এমনভাবে মারলে আর মারবার কারণই বা কি এ রহস্য দীপকেরা কিছুতেই উদ্ঘাটন করতে পারলে না।

দীপকরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ কর্‌লে, কার দ্বারা এ ব্যাপার সম্ভব হোতে পারে। আশ্রমের একজন সেবক বল্লে—দীপক, আমার মনে হয় হারাণ মণ্ডলের ছেলে সনাতন এই কাজ করেছে। সে অছিমুদ্দিনের মেয়েকে ঠাট্টা করেছিল বলে আপনি সেদিন তাকে ধম্‌কে দিয়েছিলেন, বোধ হয় সেই আক্রোশে ঐই কাজ কোরে থাকবে।

দীপকরা সকলে মিলে স্থির কর্‌লে, এখন এ বিষয় নিয়ে বেশী ঘাঁটাঘাঁটি না কোরে তলেতলে খোঁজ নেওয়া হবে।

প্রায় ছ-মাস পার হোয়ে গেল কিন্তু তবুও চারু এল না। দীপক আবার তাকে লিখ্‌লে এবং বিশেষ কোরে একবার তার সঙ্গে দেখা করতে বল্লে।

কয়েক দিন পরে সে চারুর চিঠি পেলে। চারু লিখেছে—দীপদা, এখনো মন স্থির কর্‌তে পারিনি। এ অবস্থায় আপনার সঙ্গে দেখা করতে পার্‌ব না, আমায় মাপ কর্‌বেন। আপনারা মনে করুন যে আমার মৃত্যু হয়েছে।

চারুর সঙ্গে দেখা করবে স্থির কোরে দীপক তার বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হোলো। চারু বাড়ীতে ছিল না, সে তার মার সঙ্গে দেখা কোরে তার সংবাদ সংগ্রহ করলে। চারুর মা বল্লেন— চারুর শরীর দিনে দিনে অত্যন্ত খারাপ হোয়ে পড়ছে। অধিকাংশ দিনই সমস্তক্ষণ সে নিজের ঘরের মধ্যে বসে কাটিয়ে দেয় এমন কি লোকজন দেখা করতে এলে বলে দেয় যে বাড়ীতে নেই। আবার কোনো দিন বা সকাল বেলা উঠেই বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায় আর আসে সেই রাত্রি বারোটা একটা। আজ সকালে উঠে বেরিয়েছে, কখন ফিরবে সেই জানে।

সেদিন ছিল রবিবার; দীপক চারুর ওখান থেকে সোজা অবনীদের বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হোলো।

দীপক দেখ্‌লে অবনী তার অর্দ্ধ সমাপ্ত কৃষ্ণার্জ্জুন ছবিখানা সাম্‌নে ফেলে গালে হাত দিয়ে বসে আছে! দীপক তাকে জিজ্ঞাসা করলে—এখনো ছবিখানা শেষ হোলো না?

দীপকের কথা শুনে অবনী যেন ঘুম থেকে উঠে বল্লে—হ্যাঁ!

দীপক আবার বল্লে—ছবিটা এখনো শেষ হোলো না!

অবনী বল্লে—না, কিছুতেই শেষ কর্‌তে পার্‌ছি না। অন্য দিন তো সময় পাই না রবিবারে এটাকে নিয়ে বসি কিন্তু কিছুতেই ঠিক্ কর্‌তে পার্‌ছি না।

দীপক ছবিটাকে একবার হাতে তুলে নিয়ে দেখে অবনীর হাতে ফিরিয়ে দিলে। অবনী জিজ্ঞাসা কর্‌লে, কিছু বুঝতে পার্‌লে?

দীপক বল্লে—কেন আমার তো মনে হচ্ছে বেশ হয়েছে। এটাকে ছাপতে দিয়ে দাও না।

অবনী একটু হেসে বল্লে—কিন্তু আমার যে মনে হচ্ছে এ কিছুই হয়নি। দেখ্‌তে পাচ্ছ না আত্মীয়-বিরোধে পরাঙ্মুখ অর্জ্জুন কিছুতেই অস্ত্রধারণ কর্‌তে চাইছে না। শ্রীকৃষ্ণ তাকে বল্‌ছেন যে, এ ক্ষণিকের দুর্ব্বলতা মন থেকে মুছে ফেলে দাও।

দীপক বল্লে—তা তো বুঝতেই পারা যাচ্ছে।

—কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের মুখ দেখো। আমার এই শ্রীকৃষ্ণের মুখমণ্ডল সন্দেহের ঘন ছায়ায় আবৃত। যার উৎসাহ বাক্যে অর্জ্জুন কুরুক্ষেত্র-রণে জয়ী হবে তারই যেন কোনো উৎসাহ নাই। আমার শ্রীকৃষ্ণ হয়েছেন যেন বাঙালী রাজনৈতিক বক্তা—যাঁরা বলেন যুবকগণ তোমরা অগ্রসর হও আমি পেছনে আছি। কিন্তু আজি তো তা চাই না। আমার শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডব সেনাপতির সারথি। সে শুধু তার রথ-চালনা করে না, সে সেনাপতিকে

চালনা করে। সে প্রতিজ্ঞা, সে স্থৈর্য্য ও দৃঢ়তা শ্রীকৃষ্ণের মুখে ফুটিয়ে তুলতে পারছি কই? যতবার চেষ্টা করি ততবার আমার মনের সন্দেহই কৃষ্ণের মুখে ফুটে ওঠে।

কিছুক্ষণ চুপ কোরে থেকে অবনী বল্লে—বিড়ম্বনা বন্ধু, এ বিড়ম্বনা। এবারের মতো এসব শেষ হোয়ে গেল।

অবনী কথাগুলো শেষ কোরে ছবিখানা হাতে নিয়ে একদৃষ্টে সেদিকে চেয়ে রইল। কিছুক্ষণ সেইভাবে থেকে ছবিটা নামিয়ে রেখে বল্লে—যাক্ গে! এখন বল, তোমার কথা বল। তোমার কথা যদি শোনাতে পার তাই শোনাও। তোমার উপনিবেশের খবর কি?

দীপক অভিযোগের স্বরে বল্লে—তুমি তো একদিনও দেখ্তে গেলে না। তোমরাই একদিন আমাকে এই সব কাজের মধ্যে টেনে আনিয়েছিলে আর আজ তোমরাই সরে পড়েছ।

অবনী বল্লে—আরব্য উপন্যাসে সিন্ধবাদ-বণিক-পুত্রের গল্প মনে আছে? সেই এক বেটা বুড়ো কাঁধে চাপ্লে আর নাম্তে চাইত না। সে ব্যাটা আমার কাঁধ থেকে তোমার কাঁধে উঠেছে। যতদিন না উপযুক্ত লোক পাচ্ছে সে তোমার কাঁধে চড়ে থাক্বে।

দীপক বল্লে—চল একদিন আমাদের ওখানে।

অবনী বল্লে—না ভাই, ওসব দেখ্লে আবার ওর মধ্যে লাফিয়ে পড়্তে ইচ্ছা হবে। তখন ঘরে বাইরে ফ্যাসাদ উপস্থিত হবে।

সেদিন অনেকক্ষণ অবনীর সঙ্গে গল্প কোরে দীপক উঠে পড়্ল। যাবার সময় অবনী তাকে বল্লে—ওহে আমি শুনলুম তোমার ওপরে কর্ত্তাদের নজর পড়েছে।

দীপক বল্লে—কর্ত্তাদের নেক-নজর থেকে তো আমি কোনো দিনই বঞ্চিত হইনি। তবে আবার এ নতুন সৌভাগ্যের কারণ কি?

অবনী বল্লে—তারা হয়ত মনে কর্ছে কথা নেই বার্ত্তা নেই এ লোকটা খামাকা ঘরের পয়সা খরচ কোরে পরের উপকার কর্তে চায় কেন? সন্দেহের কারণ আছে।

সংবাদটা শুনে দীপক একটু হেসে বল্লে—সংবাদটা কোথা থেকে সংগ্রহ কর্লে?

অবনী হাস্তে হাস্তে বল্লে—সুসংবাদ কখনো চাপা থাকে হে? মনে নেই যখন আমরা ধরা পড়ি তখন হাওয়ায় সে কথা ভেসে আমাদের কানে এসে পৌঁছেছিল!

দীপক বল্লে—সত্যি কথা।

অবনী বল্লে—আমার বাবা বল্ছিলেন। তাঁর আজকাল ওপাড়ায় ভারী খাতির কিনা। তুমি আমার কাছে আস যাও সে কথাও তাঁরা জান্তে পেরেছেন।

তাঁদের অসীম অনুগ্রহ—বলে হাস্তে হাস্তে দীপক সেদিনকার মতন বিদায় নিলে।

* * * *

অছিমুদ্দিন সেরে উঠ্ল। সে ছিল অতি নীরিহ প্রকৃতির

লোক। সে কারুর নামে নালিশও করলে না কিংবা কে যে তাকে এমন সাংঘাতিক ভাবে আঘাত করতে পারে সে সম্বন্ধে কারুর প্রতি সন্দেহও করলে না। অন্ততঃ দীপককে সেকথা সে বল্লে না। কিন্তু তার প্রতি এই অত্যাচারটা মুসলমানেরা নীরবে হজম করতে পারলে না। কিছুদিন বাদেই এমন একটি কাণ্ড সেখানে ঘটল যা দীপক ও উপনিবেশের অন্যান্য সেবকদের অত্যন্ত বিচলিত কোরে তুল্লে। একদিন সন্ধ্যার পরে হরিশ মণ্ডলের ছেলে সনাতন ও আরও জন কয়েককে রাত্রি বেলা জন কয়েক মুসলমান অতর্কিতে আক্রমণ কোরে খুব প্রহার দিলে। এই আক্রমণকারীরা যে কে তাও প্রকাশ হোতো না, কারণ তারা মুখে কাপড় বেঁধে পেছন থেকে আক্রমণ করেছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সনাতনদের দলের একজন যুবক আক্রমণকারীদের একজনের মাথায় একটা থান ইঁট মারায় সে অজ্ঞান হোয়ে পড়ে যাওয়ায় সকল কথা প্রকাশ হোয়ে পড়ল। দীপক এই আক্রমণকারীদের জিজ্ঞাসা করলে—তোমরা সনাতনকে কেন মারলে?

তারা বল্লে—হুজুর, ও অছিমুদ্দিনকে মেরেছিল।

সনাতন বল্লে—হুজুর, আমি অছিমুদ্দিনকে মারি নি।

মুসলমানেরা বল্লে—হুজুর, ঐ অছিমুদ্দিনকে মেরেছিল আমাদের সাক্ষী আছে।

সাক্ষী দ্বারা প্রমাণ হোয়ে গেল যে, অছিমুদ্দিন সনাতনের নামে নালিশ করায় তার ওপরে সনাতনের অনেক দিন থেকেই

রাগ ছিল, সেদিন তাকে একলা পেয়ে সে পেছন থেকে লাঠি চালিয়েছিল।

দীপক সাক্ষীদের জেরা করলে—সে সময় যখন তদন্ত করা হোলো তখন তোমরা এ কথা জানাও-নি কেন ?

সাক্ষীরা নীরব রহিল।

দীপক তাদের জানিয়ে দিলে যে এরকম ব্যাপার পুনর্ব্বার ঘট্‌লে উপনিবেশ থেকে তোমাদের তাড়িয়ে দেওয়া হবে।

সনাতন কিন্তু তার এই অপমানটা ভুলতে পারলে না। দীপকের কাছে এদের কোনো সাজা হোলো না দেখে সে আদালতের আশ্রয় নিলে। ব্যাপারটা শুনে দীপক হরিশ মণ্ডলকে ডেকে বল্লে—দেখো আমাদের উপনিবেশে থাকতে হোলে আমাদের কথামত সবাইকে চলতে হবে। হয় তুমি সনাতনকে তোমার বাড়ীতে ঢুকতে দেবে না, আর তা না হোলে তুমি তোমার পরিবারের সবাইকে নিয়ে এখান থেকে চলে যাও।

হরিশ কাঁদতে কাঁদতে জানালে যে সনাতন তার কথা মোটেই শোনে না। অমন ছেলেকে সে আর তার বাড়ীতে ঢুক্‌তে দেবে না।

মামলা রীতিমত বেধে উঠ্‌ল। দীপকরা তাদের উপনিবেশের লোকদের সাহায্য করতে লাগ্‌ল। তারা মনে করেছিল সনাতন কিছুদিন মামলা চালিয়েই অর্থের অভাবে মামলা তুলে নিতে বাধ্য হবে কিন্তু তারা দেখ্‌লে যে সনাতন

দস্তর মতন পয়সা খরচ কোরে তাদের সঙ্গে সমানে মামলা চালিয়ে যেতে লাগ্‌ল।

মাস দেড়েক মামলা চলবার পর বিচারে দীপকদের উপনিবেশের তিন জন মুসলমান প্রজার চার মাসের কয়েদ হোয়ে গেল।

মামলার সংবাদ যেদিন প্রকাশ হোলো সেদিন সন্ধ্যার সময় আল্লাবক্স কাঁদতে কাঁদতে এসে তাদের খবর দিলে—তিন দিন থেকে রূপমতীর কোনো সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না।

সংবাদটা শুনে দীপক চমকে উঠ্‌ল। সে আল্লাবক্সকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—এখানকার কোনো লোক তাকে নিয়ে সরেছে কি? খোঁজ নাও—খোঁজ নাও।

আল্লাবক্স বল্লে—এখানকার কোনো লোকের সে সাহস হবে না হুজুর। এ কোনো বাইরের লোকের কাজ। কিছু দিন থেকেই তার হালচাল বিগ্‌ড়েছিল, মাঝে মাঝে রাত কোরে বাড়ী আস্‌ত। টাকাকড়িও খরচ কর্‌ত। আমার মনে হয় এ কোনো বাবুর কাজ।

আল্লাবক্সের মুখে রূপমতীর কথা শুনে দীপক চুপ কোরে স্তব্ধ হোয়ে বসে রইল।

সন্ধ্যেবেলা উপনিবেশের সেবকেরা দীপককে ঘিরে বসে পরামর্শ কর্‌ত। কিন্তু সেদিন মামলায় হেরে যাওয়ায় সকলের মনই খারাপ ছিল। তারা কিছুক্ষণ চুপ-চাপ কোরে বসে থেকে যে যার কাজে উঠে গেল। আল্লাবক্সও কিছুক্ষণ বসে থেকে নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে দিতে উঠে চলে গেল।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে উঠতে লাগ্‌ল, দীপকের বাড়ী ফেরবার সময় হোলো কিন্তু তবুও যেন সে উঠতে পারছিল না। সেইখানে বসে বসে তার মনে হোতে লাগল যেন কোথায় তাদের বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্রের মেঘ ঘনিয়ে উঠছে, কবে অতর্কিতে আত্মরক্ষার সুযোগ না দিয়ে সে ঝড় তাদের সমস্ত উদ্যমকে ব্যর্থ কোরে দিয়ে চলে যাবে। সেই ঝড়ের মুখে হয়ত তারা উড়ে চলে যাবে—তার এত সাধের কর্ম্মক্ষেত্র শ্মশানে পরিণত হবে। এই রকম নানা চিন্তায় সে আপনহারা হোয়ে বসে রইল। হটাৎ দেওয়ালের ঘড়িতে ন'টা বাজতে সে উঠে বাড়ীর দিকে রওনা হোলো।

বাড়ীতে ফিরে খেয়েদেয়ে দীপক বিছানায় গা ঢেলে দিলে বটে কিন্তু কিছুতেই তার ঘুম হোলো না। সেদিন সনাতন মণ্ডলের কাছে হেরে গিয়ে তাদের যে অপমান হয়েছিল তার জ্বালা সে ভুলতে পারছিল না। সে ভাবতে লাগ্‌ল সনাতনকে কে সাহায্য করলে? এই দেড় মাসে উকীলকেই সে তার পাঁচশো টাকা দিয়েছে, তা ছাড়া এদিক-ওদিকেও প্রায় একশো টাকা খরচ হয়েছে। এই টাকা সনাতনকে কে দিলে? কেনই বা দিলে? ভাবতে ভাবতে তার মাথা গরম হোয়ে উঠতে লাগ্‌ল। একটু খানি ঠাণ্ডা বাতাস পাবার জন্যে সে বিছানা থেকে উঠে জানালায় দাঁড়াল।

জানালার ধারে দাঁড়িয়ে দীপক সামনের বাগানের দিকে চাইলো। গাছের ফাঁক দিয়ে তাদের বাড়ীটা দেখা যাচ্ছিল,

দীপক শান্তির ঘরের দিকে চেয়ে দেখলে তার ঘরের আলো নেভানো। তার মার ঘরে তখনও আলো জল্‌ছিল। মা জেগে আছে দেখে একবার তার মনে হোলো মার কাছে গিয়ে একটু বসি! কিন্তু তখুনি সে-ঘরের আলো নিভে গেল। সুমনার ঘরের পাশেই অনু শুতো। দীপক একবার সেদিকে চেয়ে দেখলে সে ঘরের আলো নেভানো। সেইখানে চারিদিকের সেই নিস্তব্ধ শান্তির মধ্যে দাঁড়িয়ে তার মনে হোতে লাগ্‌ল সংসারের সকলেই সুপ্তির শান্তি-নীড়ে আশ্রয় পেয়েছে একমাত্র চির-অশান্ত-অভাগ্য তার চোখেই নিদ্রা নাই। তার মনে হোতে লাগ্‌ল আজ যদি এই মুহূর্ত্তে তার সংসারের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন হোয়ে যায় তা হোলে কি হয়? কিছুই না! সংসারে কোন দিন কোন বন্ধনই তো তাকে বাঁধতে পারেনি। আজ নিজেই সে তার চারিপাশে প্রশস্ত খাঁচা তৈরি কোরে তুলেছে। এই কর্ম্মের মধ্যেই সে নিজের মুক্তির পথ খুঁজে পাবে মনে করেছিল কিন্তু এ কি হোলো!

দীপকের মনে হোতে লাগ্‌ল এর চেয়ে প্যারির সেই উদ্দাম জীবন সে কি ভালো ছিল না! প্যারির কথা মনে হোতেই তার আনার কথা মনে পড়্‌ল। আনার কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে তার মনটা ভারি হোয়ে উঠতে লাগ্‌ল। সে আবার শুয়ে পড়বার জন্য জানালা থেকে ফিরে বিছানার দিকে এগিয়ে চল্‌ল। দীপক একবার তার মাথার কাছের জানালাটা দিয়ে মুখ বাড়ালে। সে যেন দেখ্‌তে পেলে তাদের বাড়ীর একতলার একটা ঘরে আলো জল্‌ছে। ঐ এই ঘরে তার বাবা বসে লেখাপড়া কর্‌তেন।

কিন্তু মোহনের মৃত্যুর পর অনু ঘরখানা দখল করেছিল এবং সেইখানে বসে সে পড়শুনা করত। দীপকের মনে হোলো এত রাত্রে সে ঘরে কে আসতে পারে! অনু নয়তো? কিন্তু এত রাত্রে অনু সেখানে কি করছে! হয়ত কারুকে চিঠি লিখ্ছে মনে কোরে সে জানালা থেকে সরে এসে বিছানার ওপরে বস্ল। কিন্তু তখুনি আবার কি মনে কোরে সে জানালাটার ধারে গিয়ে দাঁড়াল। অনেকক্ষণ জানালার ধারে দাঁড়িয়ে থেকে সে জামা গায়ে দিয়ে নীচে নেমে গেল।

বাগানে নেমে দীপক নিঃশব্দে পদসঞ্চারে সেই ঘরখানার বাগানের দিকের একটা জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়াল। জানালা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। সে আস্তে আস্তে খড়খড়িটা তুলে দেখ্লে অনু টেবিলে বসে কি লিখ্ছে। দু-তিনখানা লেখা পাতা একদিকে পড়ে রয়েছে। দীপক কিছুতেই ভেবে ঠিক্ করতে পারলে না যে, এত রাত্রে এখানে বসে অনু কাকে চিঠি লিখ্ছে। একবার তার মনে হোলো হয়ত নির্জ্জনে বসে সে যতীনকে চিঠি লিখছে। দীপকের একবার মনে হোলো দড়াম্ কোরে জানালাটা খুলে ফেলে ওকে অবাক কোরে দেবে। কিন্তু পাছে সে আবার ভয় পেয়ে চীৎকার কোরে ওঠে এই ভয়ে সে জানালা না খুলে সেই ভাবেই পাখীটা তুলে দাঁড়িয়ে রইল।

অনু এতক্ষণ ঘাড় নীচু কোরে চিঠি লিখ্ছিল, এবার সে লেখা থামিয়ে মাথাটা তুল্লে। দীপক স্পষ্ট দেখ্তে পেলে তার দুই চোখ দিয়ে দরদর কোরে গাল বেয়ে জল পড়ছে। তাকে

সেই রকম ভাবে কাঁদতে দেখে দীপকের মনের মধ্যে নানা রকমের সন্দেহের উদয় হোতে লাগ্‌ল। অনু টেবিল থেকে একখানা কাগজ তুলে নিয়ে কিছুক্ষণ পরে মাথাটা দু-হাতে ঢেকে টেবিলের ওপরে পড়ে কাঁদতে লাগ্‌ল।

দীপক অনুর এই কাণ্ড দেখে ক্রমেই আশ্চর্য্য হোয়ে যাচ্ছিল। এবার সে অনুর পেছনের জানালাটার কাছে গিয়ে খড়খড়ির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে নিঃশব্দে জানালাটা খুলে ফেল্লে। অনু তখনো মাথা গুঁজে সেই রকম ভাবে পড়েছিল। দীপক আস্তে আস্তে জানালা টপ্‌কে ঘরের মধ্যে এসে একেবারে অনুর মাথার ওপরে হাত দিলে।

মাথায় হটাৎ ওরকম ভাবে হাত পড়্‌তেই অনু চম্‌কে মুখ তুলে দীপককে দেখ্‌তে পেলে। তারপরে সে থতমত খেয়ে টপ্‌ কোরে তার সাম্‌নে থেকে একটা ছোট্ট শিশি তুলে নিয়ে বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখলে।

দীপক জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কি হয়েছে অনু? এত রাত্রে এখানে বসে কান্না হচ্ছে কেন?

অনু কোনো কথা বল্লে না। সে আবার কাঁদতে আরম্ভ কর্‌লে। দীপক একখানা চেয়ার নিয়ে এসে তার পাশে বসে আবার সস্নেহে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কি হয়েছে আমাকে বল্‌। অনু এবারও কোনো কথা বল্লে না। দীপক আবার জিজ্ঞাসা কর্‌লে—আমায় বল্‌তে আপত্তি আছে?

অনু এবারেও কোনো কথা বল্লে না সে কেবল ঘাড় নেড়ে

তাকে জানালে যে তাকে বল্‌তে তার কোনো আপত্তি নেই।

দীপক অন্নুকে বড় ভালোবাস্‌ত। অন্নুর তখন এগারো বছর বয়স, তখন সে বাড়ী থেকে চলে গিয়েছিল আর এগারো বছর পরে বাড়ীতে ফিরে এসেও সে তাকে সেই এগারো বছরের ছোট্ট অন্নুর মতনই দেখ্‌ত। অন্নুও দীপককে দাদার মতো দেখত না। দীপক ছিল তার খেলা ও গল্প করার সঙ্গী। ছেলেবেলা কত দিন রাত্রে তার মা বাবা ঘুমিয়ে পড়ায় সে পালিয়ে দীপকের ঘরে এসে রাত দুপুর অবধি দীপকের সঙ্গে গল্প কোরে ও লুডো খেলে বাকী রাত্রিটা সেইখানেই শুয়ে কাটিয়েছে এর জন্য সে তার মার কাছে সেই ছোট্ট বেলায় যে কত বকুনি খেয়েছে তার ঠিকানা নেই।

দীপক অন্নুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বল্লে—কি হয়েছে আমাকে বল্‌। মা কিছু বলেছে—

অন্নু এবার বল্লে—না, মা কিছু বলেনি—

সে তার পাশ থেকে চারপাঁচ খানা লেখা চিঠির কাগজ তুলে গুছিয়ে দীপকের হাতে দিলে। দীপক কাগজগুলো হাতে নিয়ে পড়তে লাগ্‌ল। চিঠিখানা অন্নু তাকেই লিখেছে। চিঠির তাৎপর্য্য হচ্ছে—অন্নু যতীন সরকারকে ভালোবাস্‌ত এবং যতীনও তাকে তার ভালোবাসা জানিয়েছিল ও বিয়ে করবে বলেছিল। এই বিয়ে কর্‌বার লোভ দেখিয়ে যতীন তার সঙ্গে খুব বেশী মেশামিশি করতে আরম্ভ করে। যতীন অনেকবার তার

কুমারী ধর্ম্মের মর্য্যাদা নষ্ট করবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু অনু প্রতিবারই আত্মরক্ষা কোরে পালিয়ে এসেছে। শেষকালে এত দিন পরে যতীন তাকে জানিয়েছে তাদের এই বিয়েতে বাড়ীর মত নেই বরং বাড়ীর লোকদের চটিয়ে সে তাকে বিয়ে করতে পারবে না।

অনু চিঠিতে আরও লিখেছে যে সেই অপমানের পর সে আর কারুর কাছে মুখ দেখাতে পারবে না। এই অবস্থায় বাঁচতেও সে পারবে না তাই সে আত্মহত্যা করছে। সে দীপককে জানিয়েছে যে, সংসারে সে তার দাদাকে সব চেয়ে ভালোবাসে ও ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। আর সকলে যখন তার ওপর অবিচার করবে সে যেন তখন তাদের বুঝিয়ে বলে আর যতীন যে তাকে এতখানি অপমান করতে সাহস করেছে তার যেন প্রতিশোধ সে নেয়।

দীপক চিঠিখানা আদ্যোপান্ত পড়ে বল্লে—বিষের শিশিটা বুকে লুকিয়ে ফেল্লি? দে ওটা আমাকে। অনু কোনো কথা না বলে চুপ কোরে বসে রইল। দীপক বল্লে—দে ওটা, পাগ্‌লামো করে না।

অনু বুকের মধ্যে থেকে একটা ছোট্ট শিশি বের কোরে দীপকের হাতে দিলে। দীপক বল্লে—এই জন্য তুই শেষে বিষ খেতে যাচ্ছিলি। ছি ছি তুই আমার বোন্, না?

দীপক অনুর মনের ঠিক্ জায়গাটিতেই ঘা দিয়েছিল। সে বলে উঠল—তোমার বোন্ বলেই তো এই অপমান সহ্য করতে পারছি না।

দীপক বল্লে—এই অপমান কেন হোলো তুই বুঝ্তে পেরেছিস্?

অনু কোনো প্রশ্ন না কোরে চুপ কোরে বসে রইল। দীপক কিছুক্ষণ চুপ কোরে থেকে বল্লে—তুই কি যতীনকে ভালোবাসিস্?

অনু এবারও কোনো উত্তর দিলে না। দীপক বল্লে—ব আমাকে সব কথা খুলে বল্—আমাকে যদি লজ্জা করে তা হোলে বৌদিকে ডেকে আনি তাকে বল্—

অনু বলে উঠ্লো—না, না দাদা তোমার পায়ে পড়ি—তুমি বৌদিকে কিছু বোলো না। আমি বল্ছি—কি বল্ব?

—যতীনকে তুই এখনো ভালোবাসিস্?

অনুর চোখ দু'টো জ্বলে উঠ্ল। সে বল্লে—আমি ওকে ঘৃণা করি। যে আমার সঙ্গে এমন প্রতারণা করেছে তাকে—

দীপক চুপ কোরে রইল। অনু বলে উঠ্ল—জানো দাদা আমাকে সে রোজ জোর কোরে চুমু খেত।

অনুর কথা শুনে তার হাসি পেল। তার মনে হোতে লাগ্ল অনু সেই শ্রেণীর মেয়ে বিয়ে কর্বার প্রলোভন দেখিয়ে যাদের কাছে সব আদায় করা যায়। সে কিছুক্ষণ চুপ কোরে থেকে বল্লে—আর একজন লোক যে তোর জন্যে বিষ খাবার যোগাড় কর্ছে তার কি উপায় হবে বল্ তো?

অনু এ কথার কোনো জবাব না দিয়ে জিজ্ঞাসু-নয়নে তার দাদার মুখের দিকে চেয়ে থেকে ঘাড় নীচু করে রইল। দীপক

আবার বল্লে—তুই চারুকে বিয়ে কর, সে তোকে সত্যিই ভালোবাসে। আমি বল্‌ছি তাকে বিয়ে কর্‌লে তুই সুখী হবি।

অন্থ বল্লে—দাদা আমি বিয়ে কর্‌ব না। আমি তোমার আশ্রমের কাজ কর্‌ব।

দীপক এবার গম্ভীরভাবে বল্লে—অন্থ ছেলেমান্থষি কোরো না। তুমি নিজের মন নিজেই বুঝ্‌তে পার না। আজ চারুর কাছে ফিরে যেতে তোমার সঙ্কোচ হওয়া খুব স্বাভাবিক কিন্তু এই শাস্তি তোমার প্রাপ্য। তাকে অবহেলা কোরে তুমি তার প্রতি যে অন্যায় করেছ তার প্রায়শ্চিত্ত তোমায় করতেই হবে। আমি বল্‌ছি চারুকে তুমি বিয়ে করো—সে তোমায় ভালোবাসে তুমি তাকে এখন ভালো না বাস্‌লেও পরে বাস্‌বে। তাকে বিয়ে কর্‌লে তুমি সুখী হবে।

অন্থ কোনো কথা বল্লে না। দীপক বল্লে—যা, আজ রাত্রি হয়েছে শুতে যা—কাল সকালে আমি চারুকে গিয়ে বল্‌ব।

অন্থ আস্তে আস্তে উঠে দীপককে বল্লে—বৌদিকে কোনো কথা বোলো না দাদা।

দীপক বল্লে—না রে না—আমি কারুকে কিছু বল্‌ব না।

পরদিন ভোরবেলা দীপক চারুকে ডেকে পাঠালে—শীগ্‌গীর এস বিশেষ প্রয়োজন আছে।

চারু সকাল বেলা বাড়ীতেই ছিল। দীপকের কোনো বিপদ উপস্থিত হয়েছে মনে কোরে সমস্ত সঙ্কোচ ত্যাগ কোরে সে তার কাছে এসে বল্লে—কি দীপ-দা কি হয়েছে?

দীপক বল্লে—বসো, বল্‌ছি।

চারু বসবার পর সে তাকে বল্লে—তুমি অনুকে ভালোবাস?

চারু বল্লে—দীপ-দা সেকথা তো আপনাকে আমি জানিয়েছি—কেন আর সে কথা তুলে আমাকে যন্ত্রণা দেন!

দীপক বল্লে—আমার কথাটা আগে শোনো—

—বলুন।

অনু যদি একটা ভুল কোরে থাকে। ধর সেই ভুলের ফলে যদি সমাজে যাকে কুমারী ধর্ম্ম বলে তা নষ্ট হোয়ে থাকে, তবু তুমি তাকে গ্রহণ করতে পারো।

চারু বলে উঠ্‌ল—নিশ্চয় পারি—যদি অনু রাজী হয়।

দীপক বল্লে—অনু যদি তোমাকে ভালো না বাসে। অবিশ্যি তোমাদের দু-জনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা কতখানি ছিল তা আমি জানি না। ধর, সে এখন তোমাকে ভালোবাসে না কিন্তু পরে বাসা তো অসম্ভব নয়।

চারু বল্লে—দীপ-দা আপনি কি বল্‌ছেন আমি বুঝ্‌তে পারছি না। আমায় ও-রকম কোনো প্রলোভন দেখাবেন না—আমার মনের অবস্থা তো আপনাকে জানিয়েছি।

দীপক বল্‌তে লাগ্‌ল—দেখো অনুর বয়সের সঙ্গে তার মনটা বাড়তে পারে নি। এখন তার প্রায় চব্বিশ বছর বয়স কিন্তু তার মন পড়ে আছে সেই চোদ্দ-পনেরো-ষোলোতে। এক শ্রেণীর মেয়ে আছে যারা সমারোহের দিকে একটুতেই আকৃষ্ট

হোয়ে পড়ে। অনু হচ্ছে সেই শ্রেণীর মেয়ে। যতীনের আর কিছু না থাক চাল-চলনের যে সমারোহ আছে তাইতে অনু আকৃষ্ট হয়েছিল—তার প্রেমে নয়। যতীন লোভ দেখিয়েছিল যে, সে তাকে বিয়ে করবে সেই জন্য আমার বিশ্বাস তোমাকে সে তাইতে ত্যাগ কোরে তার দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। অনুর শিক্ষার মধ্যে এই জায়গায় একটা মস্ত গলদ আছে।

দীপক এই অবধি বলে চুপ করলে। চারু উৎসুক নয়নে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল। তার মুখ দেখে দীপকের মনে হোলো সে যে আরও কিছু শুনতে চায়।

দীপক কিছুক্ষণ চুপ কোরে থেকে বল্লে—কিছুকাল যতীনের সঙ্গে মেলামেশা করার পরই অনুর কাছে তার আসল স্বরূপ প্রকাশ হোয়ে পড়েছে। বাঘ কতকাল আর গায়ের গন্ধ লুকিয়ে থাকতে পারে। সে এখন তাকে ঘৃণা করে।

দীপক আবার কিছুক্ষণ চুপ কোরে থেকে পাশের ঘরের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বল্লে—ঐ ঘরে অনু বসে আছে। যাও, ঘরে বসে কাঁদলে মেয়েদের মন পাওয়া যায় না।

চারু আস্তে আস্তে উঠে দুরুদুরু বুকে অনু যে ঘরে বসেছিল সেই ঘরের মধ্যে ঢুকল। দীপক তার টেবিলে গিয়ে চিঠি লিখতে বসল।

অনেকক্ষণ এই ভাবে কেটে যাওয়ার পর হটাৎ একবার অনুর কণ্ঠস্বরে দীপকের চমক ভেঙে গেল। সে কলম রেখে পাশের ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল! একটু পরেই সে

অন্থুর গলা পেলে। সে বল্‌ছিল—তুমি যদি মনে কর যে আমাকে বিয়ে কোরে মস্ত একটা স্বার্থ ত্যাগ কর্‌ছ, তা হোলে দরকার নেই ও সব কথায়—

চারু তার কথায় বাধা দিয়ে বল্লে—আমাকে ভুল বুঝো না অন্থু—

দীপক দরজার কাছ থেকে চলে এল।

চারু ফিরে আসাতে উপনিবেশের স্কুলে যেন নতুন জীবনের সঞ্চার হোলো। কয়েকদিন পরেই মহাসমারোহ কোরে শান্তি-আশ্রমের উদ্বোধন উৎসব সম্পন্ন হোলো। কিন্তু এত উৎসাহের মধ্যেও দীপক যেন শান্তি পাচ্ছিল না। উপনিবেশের কয়েকজন অধিবাসীর জেল হওয়া তারপরে রূপমতী যার জন্য তার উপনিবেশের পত্তন সেই রূপমতীর অন্তর্দ্ধান এই রকম কতকগুলি কারণে সে মনে মনে অত্যন্ত অশান্তি ভোগ কর্‌ছিল। কিছুদিন থেকে এও সে লক্ষ্য কর্‌ছিল যে মুসলমানদের জেল হওয়ায় সেখানকার সমস্ত মুসলমান হিন্দু প্রজাদের ওপরে চটে ছিল, জন কয়েক মুসলমান প্রজাও দীপকের উপনিবেশকে 'হিন্দু রাজত্ব' নাম দিয়ে ঘর ছেড়ে অন্যত্র চলে গেল।

কিছুদিন এই ভাবে কাটবার পর একদিন সকালে অবনী দীপকের কাছে এসে বল্লে —আমাকে আজই যেতে হবে মির্জ্জাপুরে?

দীপক জিজ্ঞাসা করলে—কেন হে?

—স্বাতীর স্বামীর ভারি অসুখ, সে টেলিগ্রাম করেছে ডাক্তার নিয়ে যেতে। আমি সাত দিনের ছুটী নিয়ে যাচ্ছি বটে কিন্তু আর ফির্ব না।

দীপক জিজ্ঞাসা করলে—সে আবার কি?

অবনী বল্লে—তোমাকে বলেছি তো, চাক্‌রী কর্‌তে আর কিছুতেই পার্‌ছি না। এম্‌নি তো চাক্‌রিটা ছেড়ে দিয়ে আসা যায় না, সেখানে মাস দু-তিন বসে থাক্‌লে চাক্‌রী আপনিই ছুটে যাবে।

দীপক হেসে বল্লে—তারপর?

অবনী বল্লে—তারপরে আর কি! বাবা যদি বেশী হাঙ্গামা করেন তা হোলে ওখান থেকেই কোনো জায়গায় সরে পড়্‌ব। দীপক বল্লে— না না কোথাও আর সরে পোড়ো না। বাড়ীতে হাঙ্গামা দেখ্‌লে একেবারে আমাদের উপনিবেশে এসে হাজির হয়ো।

—বেশ ঐ কথাই রইল বলে অবনী সেদিন চলে গেল।

চার মাস পরে যাদের জেল হয়েছিল তারা কারামুক্ত হোয়ে আবার উপনিবেশে ফিরে এল। তারা জেল থেকে এসেই দীপককে বল্লে—আমরা আপনার প্রজা কিন্তু আপনি আমাদের সাহায্য না কোরে সেই বদ্‌মাইসটাকে সাহায্য কোরে আমাদের জেলে পাঠালেন! এই কি আপনার ধর্ম্ম হোলো?

দীপকরা তো তাদের অভিযোগ শুনে অবাক্! তা।।

তাদের বোঝাতে চেষ্টা করলে যে তারা প্রাণপণে তাদের সাহায্য করেচে কিন্তু বাইরে কোথায় তারা শুনে এসেছিল যে, সনাতন হিন্দু বলে দীপকরা লুকিয়ে তাকে দিয়ে এদের নামে নালিশ করিয়ে এই ভাবে তাদের জব্দ করিয়ে দিলে।

এই অসম্ভব কাহিনীর উৎপত্তি কোথায় হোলো, কোথা থেকে তারা এই ব্যাপার শুনলে সে সম্বন্ধে তারা একেবারে নীরব রইল। দীপকরা মাসখানেক ধরে এর খোঁজ-খবর কোরেও তার সন্ধান বার করতে পারলে না। এদিকে তারই জমিতে বিনা খাজনায় বাস কোরে, বিনা খাজনায় চাষ কোরে তার উপসত্ব ভোগ কোরে তারা এই কথা স্থিরবিশ্বাস করতে লাগল যে, দাপকরা তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কোরে তাদের জেলে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছিল।

দীপকরা কিছুদিন এই সব আলোচনা বন্ধ করবার চেষ্টা কোরে শেষে স্থির করলে যেমন কোরেই হোক্ বেশী বাড়াবাড়ি হবার পূর্ব্বেই এই আন্দোলন বন্ধ করতে হবে। একদিন তারা সভা কোরে উপনিবেশের সমস্ত লোককে ডেকে নিয়ে এসে বল্লে—এ কথা তোমাদের কে বলেছে তা প্রকাশ করতে হবে।

কয়েকজন হিন্দু প্রজা বল্লে—হুজুর যে সব মুসলমান প্রজা আমাদের গাঁ থেকে চলে গিয়েছে অথবা তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তারাই এই সব কথা রটিয়ে বেড়াচ্ছে।

দীপক বল্লে—দরকারের সময় তোমরা প্রমাণ করতে পারবে?

তারা বল্লে—না হুজুর, তা বোধ হয় পারব না।

সুবিধা পেয়ে মুসলমান প্রজারা বলে উঠল—হুজুর, এরাই সব মুসলমানদের নামে এই রকম মিথ্যা কলঙ্ক দিয়ে ঝগড়া বাধায়।

দীপক তাদের বল্লে—কথাটা তোমরাই প্রথমে তুলেছ সেই জন্য তোমাদেরই প্রকাশ কর্‌তে হবে কোথা থেকে এ সব কথার উৎপত্তি হয়েছে। তোমাদের আমরা সাত দিন সময় দিচ্ছি এর মধ্যে তোমরা যদি আসল লোক ধরিয়ে না দাও তা হোলে যে যে এই কথা প্রচার কর্‌ছো তাদের উপনিবেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে।

সভার ফলে আন্দোলনের মাত্রা আরও বেড়ে গেল। হিন্দুরা বলে বেড়াতে লাগ্‌ল যে মুসলমানদের এনে তাদের এমন রামরাজত্ব ছারখার হবার যোগাড় হয়েছে। ওদিকে মুসলমানেরা বল্‌তে লাগ্‌ল যে হিন্দুরা তাদের নামে জমিদারদের কাছে নানারকম চুক্‌লী কোরে তাঁর মন বিষিয়ে দিয়েছে। এই নিয়ে দুই পক্ষে তুমুল বাক্‌যুদ্ধ চলতে লাগ্‌ল।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে চার-পাঁচ দিন কেটে গেল কিন্তু কে যে মুসলমান প্রজাদের মধ্যে এই সব মিথ্যা রটনা করেছিল তা প্রকাশ হোলো না। ছ'দিনের দিন ভোর বেলা দীপকের কাছে সংবাদ এল যে, কাল রাত্রি থেকে তাদের উপনিবেশে ঘোরতর হাঙ্গামা চলেছে। হিন্দু মুসলমান দুই তরফেই অনেক খুনজখম হোয়ে গেছে। বাইরের অনেক লোকও হাঙ্গামায় যোগ দিয়েছে। এখনো পর্য্যন্ত সমানে দাঙ্গা চলেছে।

সংবাদ পেয়েই দীপক গাড়ী কোরে উপনিবেশের দিকে

ছুট্‌লো। সে গিয়ে দেখ্‌লে হাঙ্গামা তখন থেমে গিয়েছে। পুলিশের লোক চারিদিকে গিজ্‌গিজ কর্‌ছে। হাঙ্গামায় যারা যোগ দিয়েছিল তারা তো সরে পড়েছেই নিরপেক্ষ লোকও সেখানে নেই। কেবল মাত্র হত-আহতরা ইতস্ততঃ পড়ে আছে আর স্ত্রীলোকেরা চীৎকার কোরে কাঁদতে আরম্ভ করেছে।

দীপক সেখানে উপস্থিত হোয়েই প্রথমেই আহতদের হাঁসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা কর্‌লে। আশ্রমের দশ-বারো জন সেবক উপনিবেশে থাকত তারা হাঙ্গামা থামাতে গিয়ে সকলেই অল্প বিস্তর জখম হয়েছিল, দুই-এক জন মাথায় সাংঘাতিক আঘাতও পেয়েছিল। দীপক এই দুই একজনকে হাঁসপাতালে পাঠিয়ে বাকি সেবকদের নিজের কাছে রেখে দিলে।

পুলিশ এসে তদন্ত কর্‌তে আরম্ভ কর্‌লে। দাঙ্গাকারীদের মধ্যে অনেকেই ধরা পড়্‌ল। যারা দাঙ্গার মধ্যে একেবারে লিপ্ত ছিল না, এমন লোককেও তারা ধরে নিয়ে গেল। নেহাৎ গোবেচারা বলে পুলিশ যাদের ধর্‌লে না তারা আর বিলম্ব না কোরে দু'এক দিনের মধ্যেই জিনিষপত্র গুছিয়ে নিয়ে সরে পড়্‌ল। আবার একদিন মেটিয়াবুরুজে গঙ্গার ধারে ফিজি-যাত্রীর ভিড় জমে উঠ্‌লো। দীপকের সাধের উপনিবেশ একেবারে শ্মশানে পরিণত হোলো।

এরপর মোকদ্দমার পালা। মোকদ্দমায় দীপক ও আশ্রমের অন্য সেবকদের আসামী করা হোলো। মহাসমারোহে মামলা

সুরু হোলো। তারপরে সংবাদ-পত্রে গালাগালি ছুটতে আরম্ভ হোলো।

দীপক কিছুদিন থেকে এই রকম একটা হাঙ্গামা প্রত্যাশা করছিল বটে কিন্তু সেটা যে এমন আকস্মিক ভাবে হবে এবং তার ফলে তাদের অত সাধের উপনিবেশ ভেঙে যাবে একথা সে কল্পনাও করতে পারে নি।

* * * * *

অবনী তার কথামত প্রায় চার মাস স্বাতীর ওখানে কাটিয়ে কলকাতায় ফিরে এল। সে যা অনুমান করেছিল হোলোও তাই। চার মাস অনুপস্থিত থাকায় তার চাকরী চলে গিয়েছিল। সে বাড়ীতে ফিরেই দীপককে ডেকে পাঠালে।

অবনী বল্লে—চাকরীটি খুইয়ে এলুম আর এই সময় তোমার উপনিবেশে হাঙ্গামা বাধল!

দীপক বল্লে—মামলার হাঙ্গামা চুকে গেলে আবার ও জিনিষটাকে গড়ে তোলবার চেষ্টায় মন দিতে হবে। আমি সহজে ছাড়ব না।

অবনী হাসতে হাসতে বল্লে—তুমি তো সহজে ছাড়বে না এদিকে যে আমার বাড়ী ছাড়তে হচ্ছে। আমার শোকে মা মারা গেছেন এবার আমার চাকরীর শোকে বুঝি বাবা মারা যান। পিতৃ-মাতৃ-হত্যার পাতকী হোতে হোলো দেখছি।

দীপক বল্লে—বাড়ী যদি ছাড়তে হয় তো আমার বাড়ী রয়েছে। সেখানে তোমাকে কেউ কিছু বল্‌বে না। আমার

কথা ছেড়ে দাও, মা বৌদি অনু এরা তোমাকে পেলে সুখীই হবে।

অবনী বল্লে—স্বাতীর মুখে শুন্‌লুম অনুর নাকি বিয়ের সব ঠিক্ হোয়ে গেছে।

দীপক বল্লে—হ্যাঁ, এতদিনে তো বিয়ে হোয়ে যেত। এই সব হাঙ্গামায় বন্ধ হোয়ে গেল। ওর বিয়েটা দিয়ে দিতে পার্‌লে নিশ্চিন্ত হই।

অবনী ঠাট্টার স্বরে বল্লে—তারপর, নিজে বিয়ে কর্‌বে না?

দীপক চুপ কোরে রইল। এ কথার সে কোনো জবাব দিলে না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটবার পর অবনী বল্লে—হ্যাঁ, একটা কথা তোমায় বলি—ভুলে গেলে হয়তো আর বলা হবে না। যদি সংসার-সংগ্রামে কখনো পরিশ্রান্ত হোয়ে পড়ো তা হোলে স্বাতীর কাছে যেও শান্তি পাবে!

দীপক এ কথারও কোনো জবাব দিলে না। অবনী আবার বল্লে—এটা আমার মনগড়া কথা নয়। একথা স্বাতী তোমাকে বল্‌তে আমায় অনুরোধ করেছে।

দীপক কিছুক্ষণ ঘাড় হেঁট কোরে থেকে বল্লে—আচ্ছা উঠ্‌লুম, এখুনি আবার আদালতে ছুট্‌তে হবে।

যেতে যেতে সে বল্লে—বাড়ীতে বেশী গোলমাল হোলে আমার ওখানে যেও, বুঝ্‌লে?

অবনী একটু ম্লান হাসি হাসলে মাত্র।

* * * * *

সেদিন সন্ধ্যাবেলা আদালত থেকে ফিরে আসতেই শান্তি বল্লে—ঠাকুরপো, কি সর্ব্বনাশ হয়েছে শুনেছ ?

দীপক বল্লে—না, কি হয়েছে ?

—তোমার বন্ধু অবনী আত্মহত্যা করেছে।

দীপকের মনে হোলো হঠাৎ যেন কে তার বুকের মধ্যে একটা তীক্ষ্ণ ছুরির ফলা চালিয়ে দিলে। সে কাঁপতে কাঁপতে বুকে হাত দিয়ে বসে পড়্‌ল ! শান্তি তাড়াতাড়ি পাখাটা চালিয়ে দিয়ে তার পাশে এসে বস্‌ল। দীপকের অবস্থা দেখে সে কিছু বল্‌তে পার্‌লে না। একটু পরে দীপক জিজ্ঞাসা কর্‌লে—বন্দুকের গুলিতে তো ?

—হ্যাঁ; তুমি কি কোরে জান্‌তে পার্‌লে ?

দীপক রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বলে ফেল্লে—আমি জান্‌তুম।

শান্তি বল্লে—তুমি জান্‌তে তবুও—

দীপক তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বল্লে—আমার সন্দেহ যে এত শীগ্‌গীর সত্যে পরিণত হবে তা কল্পনাও কর্‌তে পারিনি।

শান্তি বল্লে—আত্মহত্যা করেছে সেই বেলা বারোটার সময়। এতক্ষণ আমরা কিছুই জান্‌তে পারিনি। এই মাত্র এখান দিয়ে শব নিয়ে যাচ্ছিল তাদের কাছে আমরা খোঁজ নিয়ে সমস্ত জান্‌তে পার্‌লুম।

দীপক তখুনি উঠে পড়্‌ল। শান্তি জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কোথায় যাচ্ছ ?

দীপক যেতে যেতে বল্লে—একবার শ্মশানে যাই—

শ্মশানে বসে এবং সেখান থেকে বাড়ীতে ফিরেও দীপকের কেবলই মনে হোতে লাগ্‌ল যে অবনীকে সে বাঁচাতে পারত। দ্বীপান্তর থেকে ফিরে আসবার পর প্রথম যখন অবনীর সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল সেই দিনই' অবনীর কথাবার্ত্তা শুনে তার মনে হয়েছিল যে, জীবনে তার বিতৃষ্ণা এসেছে এবং সেইটে যেদিন অসহ্য হবে সেই দিনই আত্মহত্যা কোরে জীবনের ভার নামিয়ে দিতে সে প্রস্তুত। কিন্তু তার পরে ক্রমে এই ভাবটা তার মন থেকে যেন সরে গিয়েছিল। আজ সকালে কথাবার্ত্তার মধ্যে আবার আগেকার সেই বিতৃষ্ণা ফুটে উঠেছিল কিন্তু এত শীগ্‌গীর যে সে আত্মহত্যা কর্‌বে এ তার কল্পনাতেও আসেনি। দীপক বিছানায় শুয়ে শুয়ে সকলের অগোচরে তার মহাপ্রাণ বন্ধুর জন্যে নীরবে অশ্রুমোচন কোরে মনটা হাল্‌কা কর্‌বার চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌ল।

দাঙ্গার মামলা শেষ হোলো। উপনিবেশের হিন্দু ও মুসলমান অনেক প্রজার শাস্তি হোয়ে গেল। কিন্তু সব চেয়ে বেশী মাত্রায় হোলো উপনিবেশের তরুণ সেবকদের। প্রমাণ হোয়ে গেল যে, তারাই নাকি ভেতরে ভেতরে উভয়পক্ষের মধ্যে অসন্তোষের বীজ ছড়াচ্ছিল এবং হাঙ্গামা থামাবার অছিলায় তাদের হাতের লাঠিগুলোই নাকি ঘুরেছিল বেশী।

দীপককেও এই হাঙ্গামায় জড়াবার চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু তার বিরুদ্ধে তেমন প্রমাণ পাওয়া গেল না বলে সে মুক্তি পেল।

বেলা বারোটার সময় রায় প্রকাশ হবার পর আশ্রমের যে সব সেবকেরা মুক্তি পেয়েছিল তাদের নিয়ে দীপক তাদের জনশূন্য উপনিবেশে ফিরে এল। যারা মুক্তি পেয়েছিল তারা প্রায় সকলেই মফস্বলের ছেলে। দীপক তাদের টাকা দিয়ে সেইদিনই দেশে পাঠিয়ে দিলে। তারপর বেলা যতক্ষণ না পড়ে এল ততক্ষণ সে তার নিজের হাতে গড়া উপনিবেশের ধ্বংসাবশেষের

চারিদিকে ঘুরে ঘুরে শেষকালে বাড়ীর দিকে পা চালিয়ে দিলে।

বাড়ীর দিকে যেতে যেতে এক জায়গায় বিস্তর লোক সমাগম দেখে সে দাঁড়িয়ে সংবাদ সংগ্রহ করলে যে অবনীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করবার জন্ত সেখানে সভা হচ্ছে। সে সবার অগোচরে সভার মধ্যে ঢুকে এক কোনে একখানা খালি চেয়ারে গিয়ে বসে পড়ল।

সভা তখন আরম্ভ হোয়ে গিয়েছে। একজন বক্তা বক্তৃতা দিচ্ছিলেন যে, অবনীর মৃত্যুতে বাংলা দেশের যে স্থানটা শূন্য হোয়ে গেল তা সহজে পূর্ণ হবার নয়। তার অনাবিল দেশপ্রেম, কলা-সরস্বতীর প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ এই সকলের উদ্দেশ্যে অনেক স্তুতিবাদ কোরে বক্তা আসন গ্রহণ করলেন। বক্তা আসন গ্রহণ করবার পর সভাপতি ম'শায় উঠে বল্লেন, আমি জান্‌তে পারলুম যে অবনীবাবুর অকৃত্রিম সুহৃদ শ্রীযুক্ত দীপক মিত্র এই সভায় উপস্থিত আছেন। উপস্থিত জনমণ্ডলীর ইচ্ছা যে এই সভায় তিনি কিছু বলেন।

দীপক এক কোনে বসেছিল কিন্তু সভাপতির আহ্বানে সেখান থেকে উঠে গিয়ে বেদীর ওপর দাঁড়াল। সে বল্লে—আপনারা আমায় ক্ষমা করবেন, আমি কিছু বল্‌তে পারব না।

সকলে চীৎকার কোরে উঠল—না না আপনাকে বল্‌তেই হবে।

সবার অনুরোধ এড়াতে না পেরে দীপক বল্‌তে আরম্ভ

কর্‌লে—আমি এখানে এসেছিলুম নীরবে বন্ধুর স্মৃতির তর্পণ কোরে চলে যাব বলে কিন্তু আপনারা যখন অনুরোধ কর্‌ছেন তখন কিছু বল্‌তেই হবে। আপনারা এতক্ষণ ধরে অনেকের মুখে তার দেশভক্তি, তার কলানুরাগের অনেক প্রশংসার কথা শুন্‌লেন। কিন্তু সে ছিল আমার আশৈশব বন্ধু, সহচর ও সহযোগী। তার যে গুণগুলি সকলেরই জানা আমিও যদি সেই কথাগুলিই এখানে আবৃত্তি কোরে যাই তা হোলে আমাকে আহ্বান করার সার্থকতা কোথায়? আমি তার জীবনের এমন কতগুলো কথা বল্‌তে চাই সাধারণের কাছে যা অগোচর ছিল।

দীপক দেখ্‌লে সভাস্থ সকলে একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে আছে। অবনীর বাবা কুমার অমূল্যরতন চৌধুরী ঘন ঘন নাসিকা মার্জ্জনা করছেন।

দীপক আবার সুরু কর্‌লে—অবনীর ছিল অকৃত্রিম দেশানুরাগ। দেশের জন্য হাসতে হাসতে মরণকে সে আলিঙ্গন কর্‌তে পারত। তার পরিচয় আপনারা নিশ্চয় পেয়েছেন কিন্তু যতদিন সে বেঁচে ছিল ঘরে কিংবা বাইরে কোনো জায়গা থেকেই সে সহানুভূতি পায় নি; যা পেয়েছিল তা বাধা। আজ তার মৃত্যুর পর তার নামে শোকসভা কর্‌বার কোনো অধিকার আপনাদের নেই।

সভাস্থ সকলে চঞ্চল হোয়ে উঠ্‌ল। কিন্তু দীপক সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না কোরে বলে যেতে লাগ্‌ল—কিন্তু দেশ-হিতৈষী অবনীর মৃত্যুর জন্য দায়ী কে তা কি আপনারা জানেন? দায়ী

তার পিতা অমূল্যরতন চৌধুরী—এই শোকসভায় সকলের পূরোভাগে যাঁকে আসীন দেখ্‌ছি।

চারিদিক থেকে রব উঠ্‌ল—শেম্—শেম্।

দীপক তাদের কথায় গ্রাহ্য না কোরে বলে যেতে লাগ্‌ল কিন্তু দেশহিতৈষণা অবনীর যতই অকৃত্রিম হোক্ না কেন অন্তরে সে ছিল কাপুরুষ তাই সে দ্বীপান্তরবাসের কষ্ট সহ্য কোরেও পিতার অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষার জন্য আত্মহত্যা করেছে। এমন ভাবে নিজেকে নষ্ট করা আর যেই সমর্থন করুক না—

আবার চারিদিক থেকে রব উঠ্‌ল—চুপ চুপ—শেম্—শেম্—

সভাপতি দীপককে আর বল্‌তে না দিয়ে বসিয়ে দিলেন। কিন্তু সভার মধ্যে তখন এমন গোলমাল সুরু হয়েছিল যে সভা ভেঙে গেল।

দীপক ধীরে ধীরে সভাক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে এসে বাইরে দাঁড়াল। উত্তেজিত জনসঙ্ঘ চেঁচাতে লাগ্‌ল—মেরে ওর হাড় গুঁড়িয়ে দাও—মনে করেছে কি!

দীপক একজায়গায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে মন্থর গতিতে বাড়ীর দিকে এগিয়ে চল্‌ল।

অনেকক্ষণ পথে পথে ঘুরে অবসন্ন দেহ-মন কোনো রকমে টান্‌তে টান্‌তে দীপক যখন বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হোলো তখন রাত্রির প্রথম প্রহর অতীত হোয়ে গিয়েছে। ঘরের মধ্যে ঢুকে সে আলো না জ্বালিয়েই বিছানায় শুয়ে পড়্‌ল। প্রায় ঘণ্টাখানেক সেইভাবে পড়ে থেকে সে একবার উঠে

জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। শান্তির ঘরে আলো জ্বলছে দেখে সে তার বাড়ী থেকে নেমে বড়বাড়ীর দিকে অগ্রসর হোলো।

শান্তির ঘরের দরজা বন্ধ ছিল ; দীপক দরজায় কয়েকটা টোকা মারতেই ভেতর থেকে শান্তি সাড়া দিলে—কে ?

দীপক কোনো কথা না বলে আবার কয়েকটা টোকা দিলে। শান্তি দরজা খুলেই দীপককে দেখ্‌তে পেয়ে একেবারে তার হাত ধরে ঘরের মধ্যে নিয়ে বসিয়ে বল্লে—তোমার জন্যে সেই দুপুর থেকে বসে বসে এই উঠে আস্‌ছি। আজ না তোমাদের রায় বেরুবার কথা ছিল ?

দীপক বল্লে—রায় দিয়েছে। সবারই জেল হয়েছে কেবল আমাকে ও জনকয়েক ছেলেকে নেহাৎ হতভাগা ভেবে ছেড়ে দিলে।

শান্তি অনুযোগের সুরে বল্লে—খবরটার জন্য আজ সারা দিন যে কি অশান্তিতে কেটেছে—

দীপক বল্লে—খবরটা ঠিক্ সময়েই পেতে কিন্তু পথে অবনীর শোকসভায় আট্‌কে গিয়েছিলুম।

দীপক শান্তিকে শোকসভার সমস্ত বিবরণ খুলে বল্লে। সমস্ত কথা শুনে শান্তি বল্লে—যাক্ আর ওসব হাঙ্গামায় কাজ নেই। এখন ঘরের ছেলে ঘরে বসে থাক।

দীপক বল্লে—বৌদি আমি তোমার কাছ থেকে বিদায় নিতে এসেছি।

বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে দীপক বল্লে—সে কি! কোথায় যাবে?

দীপক বল্লে—কোথায় যে যাব তা জানি না। যেদিকে হয় একদিকে চলে যাব। মনটা বড় অশান্ত হোয়ে আছে। যদি আবার মন স্থির কর্‌তে পারি তবে ফির্‌ব আর তা না হোলে মনে কোরো আমি মরে গিয়েছি।

শান্তি ঘাড় হেঁট কোরে দীপকের কথাগুলো শুনে গেল। তার বক্তব্য শেষ হোয়ে গেলেও সে ঘাড় তুল্লে না। দীপক জিজ্ঞাসা করলে—আমাকে তোমার কিছু বল্‌বার আছে?

শান্তি আরও কিছুক্ষণ ঘাড় হেঁট কোরে থেকে হঠাৎ মুখ তুলে দীপকের দিকে চাইলে। তার এই চোখ অশ্রুতে ভরা। সে ধীরে ধীরে বল্লে—বল্‌বার—হ্যাঁ বল্‌বার অনেক কথাই ছিল কিন্তু থাক্—

শান্তির মুখের দিকে দীপক অবাক্ হোয়ে চেয়ে রইল। দীপকের মনে হোতে লাগ্‌ল এই কি সেই মুখ যাকে বাল্যে, কৈশরে, যৌবনে প্রতিদিন প্রতিঘণ্টায় দেখে দেখে আ[র] জীবনের এতগুলো দিন তা'র কেটে গিয়েছে! এই কি সেই নারী এতদিন যে সেবায়, সাহচর্য্যে ও সহানুভূতিতে তার জীবনকে মধুর কোরে রেখেছে! দীপকের মনে হোলো ঠিক্ এই তো সেই। এতদিন আমার এই অন্ধ-চোখ এই নারীকে চিন্‌তে পারেনি। প্রতিদিন সে তো তার চোখে এই দৃষ্টিই দেখেছে। তাই বটে, তাই বটে, সে পৃথিবীর কোথাও

গিয়ে শান্তি পায়নি, সংসারের সমস্ত বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত কোরে বাইরের কাজে সম্পূর্ণভাবে আপনাকে বিলিয়ে দিতে চেষ্টা কোরেও প্রতিপদে সে আকর্ষণ অনুভব করেছে। নিজেকে সে চারদিকে বিক্ষিপ্ত কোরে রেখেছিল বলে অবহেলায় এতদিন সে তার এই মূর্ত্তি দেখ্‌তে পায়নি। আজ তার বাহিরের বন্ধন ছিন্ন তাই বুঝি—

দীপক নিজের জায়গা থেকে উঠে গিয়ে আবেগে শান্তির হাত দু'খানা ধরে বল্লে—এতদিন কেন বলনি—আমি যে অন্ধ—অন্ধ ছিলুম—বুঝ্‌তে পারিনি।

দীপক আর কোনো কথা বল্‌তে পারলে না, আবেগে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হোয়ে এল। শান্তিও কোনো কথা বল্লে না, দু'জনে হাতে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। অনেকক্ষণ এইভাবে কেটে যাওয়ার পর শান্তি বল্লে—যদি যাবে তা হোলে আমায় নিয়ে চল—তোমাকে ছেড়ে আর আমি থাকৃতে পারব না।

দীপক বল্লে—কোথাও যাব না আমি। আজ থেকে প্রতিজ্ঞা করলুম্ বাড়ী ছেড়ে—

বাইরে থেকে সুমনার কণ্ঠস্বর শোনা গেল—বৌমা দীপক এসেছে বুঝি ?

শান্তি দরজার কাছে গিয়ে বল্লে—হ্যাঁ মাসীমা !

সুমনা দীপকদের মামলার খবর পাবার জন্য অস্থির হয়েছিল। রাত্রি দশটার পরও সে না আসায় তিনি শুয়েছিলেন বটে কিন্তু ঘুমোননি। শান্তির কথা শুনে তিনি ঘরের মধ্যে এসে দীপককে

জিজ্ঞাসা করলেন—কিরে দীপক, মামলার কি হোলো বাবা? দীপক হাসতে-হাসতে বল্লে—তোমার ভালো ছেলেটীকে জেলখানায় রাখতে তারা রাজী হোলো না মা। এবারের মতো তারা ছেড়ে দিলে।

সুমনা বল্লেন—এবার অন্নুর বিয়ের বন্দোবস্ত কর।

দীপক বল্লে—হ্যাঁ, কাল পরশু নাগাদ নোটিশ দিয়ে দেওয়া যাক্।

সুমনা, শান্তি ও দীপক তিনজনে বসে অন্নুর বিয়ের কথা আলোচনা করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ আলোচনা কোরে স্থির হোলো কাল সকাল বেলা শান্তি ও দীপক খরচের হিসাবটা কোরে ফেলবে। এই অবধি ঠিক্ কোরে দীপক নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়ল।

দীপক বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল বটে কিন্তু সে ঘুমুতে পারল না। উপনিবেশের হঠাৎ ঐ অবস্থা হওয়ায় সন্ধ্যার সময় তার মনটা একেবারে মুষড়ে পড়েছিল কিন্তু নিঃস্ব যে সে যদি হঠাৎ জানতে পারে সে একটা রাজ্যের মালিক তা হোলে আনন্দের আতিশয্যে সে পাগল হোয়ে ওঠে। আজ দীপকের এই নতুন অভিজ্ঞতায় সে আনন্দে পাগল হোয়ে উঠল। সারা রাত্রি বিনিদ্র অবস্থায় সে বিছানায় এপাশওপাশ কোরে কাটিয়ে সকাল বেলার দিকে ঘুমিয়ে পড়ল।

বেলা অনেকখানি গড়িয়ে যাবার পর শান্তি এসে তাকে ঘুম থেকে তুলে বল্লে—ওঠো, হিসাবটা করতে হবে না?

দীপক বিছানা থেকে উঠে মুখটুখ ধুয়ে অন্থর বিয়ের খরচের হিসাব করতে সুরু করলে।

বাড়ী সাজাবার হিসাবটা সবেমাত্র শেষ হয়েছে, তার আলোচনার জের তখনো মেটেনি এমন সময় চাকর এসে সংবাদ দিলে—দু'টি লোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেচেন।

শান্তি অসহিষ্ণুভাবে চাকরকে বল্লে—এখন বাবুর সঙ্গে দেখা হবে না বলে দে।

চাকর চলে গিয়ে তখুনি ফিরে এসে বল্লে—বাবুরা বল্লেন যে দেখা না কোরে যাবেন না।

দীপক বল্লে—আচ্ছা বৌদি, কিছুক্ষণের জন্য না হয় তুমি ও ঘরে গিয়ে বোসো। দেখি কে এসেছে।

শান্তি উঠে চলে যেতেই দীপক চাকরকে বল্লে—যা, ডেকে নিয়ে আয় বাবুদের।

চাকর নীচে গিয়ে বাবুদের নিয়ে এল। ভদ্রলোক দু'টি দীপকের সম্পূর্ণ অপরিচিত। তারা এসে দীপককে নমস্কার কোরে জিজ্ঞাসা করলে—আপনার নাম কি দীপক মিত্র?

দীপক বল্লে—আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনাদের কি প্রয়োজন?

একজন বল্লে—আমাদের প্রয়োজনটা মোটেই সুখকর নয়, কিন্তু কি করব বলুন—চাকরীর দায়ে বাধ্য হোয়ে করতে হচ্ছে।

দীপক ধাঁ কোরে বল্লে—বুঝেছি আপনারা তা হোলে পুলিশের লোক?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—ভণিতা না কোরে চটপট্‌ বলে ফেলুন কি জন্য এসেছেন!

লোকটী তখনো আম্‌তা আম্‌তা করতে লাগ্‌ল। দীপক মুখ তুলে দেখ্‌লে শান্তি দরজা ফাঁক কোরে মুখখানা বাড়িয়ে উদ্‌গ্রীব হোয়ে তাদের কথাবার্ত্তা শুন্‌ছে। সে মুখখানা শান্তির দিক থেকে ফিরিয়ে তাদের দিকে তাকাতেই সেই লোকটী বল্লে—আপনাকে এখুনি আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।

—কোথায়?

—তা জানি না। আপাততঃ থানায় যেতে হবে তারপর হয়তো অন্য কোথাও যেতে হবে। আপনি বাড়ী থেকে বিদায় নিয়ে আসুন।

আপনারা বসুন, আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আস্‌ছি বলে দীপক সোজা শান্তি যে ঘরে আছে সেই ঘরে গিয়ে ঢুক্‌লো।

শান্তি তাদের সমস্ত কথাই শুনেছিল। সে বল্লে—এ সব আবার কি?

দীপক বল্লে—মাকে আর অনুকে গিয়ে খবর দাও। আমাকে এক্ষুণি যেতে হবে।

শান্তি যেন কোনো কথা বুঝতে পারলে না। সে দীপকের মুখের দিকে চেয়ে রইল। দীপক বল্লে—যাও আর সময় নেই।

শান্তি কাঁপতে কাঁপতে সিড়ি দিয়ে নেমে গেল। সুমনা

আর অম্বু খবর পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এসে দীপককে জড়িয়ে ধরল্লে। দীপক মাকে প্রণাম কোরে বল্লে—এখন কেঁদো না মা, আমি চলে গেলে তারপরে কেঁদো।

শান্তি দীপকের মুখের দিকে চেয়ে কাঠের মতন দাঁড়িয়ে রইল।

পুলিশের লোকদের সঙ্গে বেরিয়ে যাবার প্রায় একমাস পরে সংবাদ এল যে ব্রহ্মদেশের প্রান্ত সীমায় এক জেলখানার মধ্যে দীপককে বন্দী কোরে রাখা হয়েছে। সেখানে তার কোনো ভাবনা নেই। সে বেশ সুখেই আছে।

দশ বছর পরে হারাণো ছেলেকে ফিরে পেয়ে আবার তাকে এই ভাবে হারাণোর শোক সুমনা সহ্য কর্‌তে পার্‌লেন না। দীপক চলে যাবার কয়েক সপ্তাহ পরেই তিনি শয্যাশায়ী হোয়ে পড়্‌লেন। মাসের শেষে একবার দীপকের একখানি পত্র আস্‌ত—সে লিখ্‌ত আমি বেশ ভালোই আছি। আমার জন্য কোনো ভাবনা কোরোনা। তোমরা কেমন আছ? মা কেমন আছেন?

অল্প এই কয়েকটা কথাকে শান্তি ও অনু মাসের প্রতিদিন নতুন নতুন রূপ দিয়ে সুমনার কাছে বল্‌ত।

অনু ও শান্তি প্রতি সপ্তাহেই দীপককে চিঠি লিখ্‌ত। তার লিখ্‌ত—সুমনা ভালো আছেন।

সুমনা রোগ-শয্যায় পড়ে পড়ে বল্‌তেন—তার কি খেতে ভালো লাগে লিখ্‌তে বল্‌বে।

উত্তরে দীপক লিখ্‌ত—আমার সব জিনিষই খেতে ভালো লাগে আবার কিছুই খেতে ভালো লাগে না। তোমাদের কোনো কিছু পাঠাতে হবে না।

চিঠি পেয়ে শান্তি সুমনাকে গিয়ে বল্‌ত—দীপক লিখেছে কিশমিস্‌, আখরোট ও আপেল পাঠিয়ে দিতে।

সেদিন সুমনা সারাদিন খোঁজ নিতেন—ওরে দীপকের জিনিষগুলো পাঠান হোলো?

বছরখানেক কেটে যাবার পর দীপক লিখ্‌লে—তোমরা অনুর বিয়ে দিয়ে দাও। আমাকে কবে ছেড়ে দেবে তার ঠিকানা নাই।

শান্তি গিয়ে সুমনাকে জানালে—দীপক অনুর বিয়েটা দিয়ে দিতে লিখেছে।

সুমনা এত দিন অনুর বিয়ের কথা তুল্‌তেই দিতেন না। তিনি বল্‌তেন—দীপক ফিরে না এলে ও-সব কিছুই হবে না। কিন্তু সুমনা বোধ হয় বুঝ্‌তে পার্‌ছিলেন যে, তাঁর দিন ফুরিয়ে এসেছে। শান্তির কথা শুনে তিনি বল্লেন—দীপক যখন লিখেছে তখন আর দেরী কোরো না।

অনুর বিয়ের কিছুদিন পরেই সুমনা মারা গেলেন। শান্তি সেই জনশূন্য বিরাট প্রাসাদে একলা দিন কাটাতে লাগ্‌ল।

মায়ের মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে দীপক শান্তিকে লিখ্‌লে—মা বেঁচে

গেলেন। কত দিন মায় কষ্ট সহ্য হয় বল? আমার এই দুঃখ যে আমি বাবা মা দুজনেরই মৃত্যুর কারণ হলুম।

শান্তির একলা আর দিন কাটে না। মাঝে মাঝে অনু এসে তার কাছে থাক্ত বটে কিন্তু তার একলার সংসার ছেড়ে সে বেশী দিন থাক্তে পার্ত না। মাসের শেষে দীপকের একখানা অতি সাক্ষিপ্ত চিঠি তাও দুর্লভ হোয়ে পড়্তে লাগ্ল। এখন দু'মাসে একখানা কি তিন মাসে দু'খানা তাও অতি সংক্ষিপ্ত— তুমি কেমন আছ। আমি বেশ শান্তিতে আছি।

তারপর এক দিন সংবাদ এল যে দীপক পীড়িত। শান্তি সংবাদ পেয়ে উতলা হোয়ে উঠ্ল কিন্তু কি করবে সে! কোথায় বর্ম্মার কোন্ প্রদেশের জেলখানায় সে রোগ-শয্যায় পড়ে আছে কি কোরে সে সেখানে যাবে!

প্রায় বছরখানেক থেকে রোজ সন্ধ্যার সময় দীপকের জ্বর আস্‌ছিল। এই জ্বর রাত্রে বাড়্ত আর সকাল বেলা ঘাম দিয়ে ছেড়ে যেত। দীপক প্রথম থেকেই জ্বরকে গ্রাহ্য করে-নি, শেষকালে জ্বর আর ছাড়্ত না। ডাক্তার এসে পরীক্ষা কোরে বল্লেন—সন্দেহ হচ্ছে যে যক্ষ্মা হয়েছে।

দীপক ডাক্তারকে বল্লে—সে বিষয়ে আমার কিন্তু কোনো সন্দেহ নেই।

—

তারপর এক দিন মৃত্যুর দূত শিরায় শিরায় উত্তাপের শিহরণ ও রক্ত নিশান উড়িয়ে তার সাম্‌নে এসে দাঁড়াল। জেলার এসে

তাকে জানালে কর্ত্তৃপক্ষ তোমাকে ছেড়ে দিতে চান। তোমার আত্মীয়দের চিঠি লেখো তারা এসে তোমাকে নিয়ে যাক্।

দীপক জেলারকে বল্লে—কর্ত্তৃপক্ষকে আমার অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে বল্‌বেন যে, আমি এইখানেই থাকতে চাই। আমার বাড়ীতে কেউ নেই। যিনি আছেন তাঁকে আমার সংবাদ আপনারা জানাবেন না।

দীপকের আবেদন মঞ্জুর হোয়ে গেল। সে সেখানেই শেষ দিনক'টা কাটিয়ে দেবার অনুমতি পেলে।

সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি দীপকের জ্বর বেশী থাকত না। এই সময়টা নিশ্চল নিস্পন্দ হোয়ে চোখ বুঁজিয়ে পড়ে থাকত। তাকে দেখ্‌লে মনে হোতো বেঁচে থেকেও সে যেন মৃত্যুরে ওপারের রাজত্বে চলে গেছে। নিঃস্ব অন্নদাস যেমন ধনীর প্রাসাদে প্রাচুর্য্যের মধ্যে সর্ব্বদা সশঙ্কিত ও নিজের অস্তিত্ব গোপন রেখে চল্‌তে চায় তেমনি চারিদিকে জীবনের এই প্রাচুর্য্যের মধ্যে ওপারের যাত্রী দীপক নিজেকে যেন সম্পূর্ণরূপে গোপন কোরে ফেল্‌তে চাইছিল।

নার্স এসে মুখের কাছে ওষুধ কিংবা খাবার ধর্‌লে সে নিঃশব্দে চোখ বুঁজিয়েই খেয়ে ফেল্‌ত। সন্ধ্যার পর জ্বর বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার যন্ত্রনা বেড়ে উঠ্‌ত। নার্স মাথায় হাত বুলিয়ে দিত কিন্তু পরের সেবা সে কোনো কালেই সহ্য করতে পারত না। ধীরে ধীরে সে তার হাতখানা মাথা থেকে সরিয়ে দিত।

এক দিন দীপক তার মাথা থেকে হাত সরিয়ে দিতে গিয়েই

বুঝ্তে পার্লে এ নার্সের হাত নয়। সে চোখ খুলে দেখ্লে শান্তি তার শিয়রে বসে আছে। দীপক ধুঁক্তে ধুঁক্তে একটু হেসে জিজ্ঞাসা কর্লে—তুমি কি কোরে এলে ?

শান্তি বল্লে—আমি এদের কাছে তোমার সেবা কর্ব এই অনুমতি নিয়ে এসেছি। এরা বলে দিয়েছে যে বেশী যদি বিরক্ত হয় তো আমাকে চলে যেতে হবে।

দীপক আর একটু হেসে শান্তির মুখের দিকে চেয়ে রইল। শান্তি জিজ্ঞাসা কর্লে—এত দিন আমাকে খবর দাও নি কেন ?

দীপক কিছু না বলে আবার একটু হাসলে।

শান্তির আসার পর থেকে দীপকের রোগ-যন্ত্রণা যেন অনেক কমে গেল। আগে দিবারাত্র কথা না বলে সে চুপ কোরে পড়ে থাকৃত, কিন্তু এখন থেকে সে সব সময়েই কথা বল্তে আরম্ভ কোরে দিলে। জীবন মৃত্যুর মধ্যের যবনিকা ভেদ কোরে ওপারের রাজত্বের যেসব সংবাদ দীপকের কাছে এসেছিল সারাক্ষণ ধরে সে কথা শান্তির কাছে বলে যেতে লাগ্ল কিন্তু এ রকম বেশী দিন চল্ল না। দীপকের রোগ উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছিল, এবার সে মাঝে মাঝে ভুল বক্তে আরম্ভ কর্লে।

সারারাত্রি অত্যন্ত যন্ত্রণার পর সেদিন সকালের দিকে দীপক ঝিমিয়ে পড়েছিল। ঘুম তার একেবারে হোতো না। বাঁ দিকের ফুস্ফুস্টা চেপে সে কোনো রকমে নিঃশ্বাস টান্ত। কিন্তু সে শত ছিদ্র ফুস্ফুসের কতটুকু শক্তি ! সারারাত্রি মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ কোরে ক্লান্ত শরীর তার এলিয়ে পড়েছিল। মাথার কাছে

শান্তি সাশ্রুনয়নে বসে। মাঝে মাঝে সে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। হঠাৎ চম্‌কে পাশ ফিরে চোখ চেয়ে দীপক বলে উঠ্‌ল—খানা—খানা এসেছিল যে!

তারপর খানিকক্ষণ শান্তির মুখের দিকে বিহ্বল ভাবে চেয়ে থেকে সে বল্লে—তুমি আমাকে চেন্‌না বুঝি!

শান্তি কোনো জবাব না দিয়ে তার কপালে হাত বুলিয়ে দিতে লাগ্‌ল। দীপক বল্‌তে আরম্ভ কর্‌লে—আমার কথা, নতুন জীবনের কথা—ব্যর্থতার লজ্জা যেখানে নাই, ভালোবাসার কুণ্ঠা যেখানে অপরিচিত—আমার সাফল্যে যে জীবন আত্মহারা—

কিন্তু সে জীবনের কথা থাক্। সেদিন ঘরে ঘরে সন্ধ্যাদীপ জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে প্রবাসী দীপকের জীবন প্রদীপ নিভে গেল।

শেষ